স্বপ্ন সম্ভার

শচীন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়



কলিকাতা-২৬

প্রথম প্রকাশ : ১লা মাঘ, ১৩৬৮

প্রকাশক :
অমলকান্তি সেনগুপ্ত
বর্তিক-এর পক্ষে
১/৩২ এফ, প্রিন্স গোলাম মহম্মদ রোড
কলিকাতা-২৬
টেলিফোন : ৪৬-৮৪৭৫
৪৬-৭৫২৯

মুদ্রাকর :
নির্মলেন্দু দাশগুপ্ত
মেট্রোপলিটান প্রিন্টিং এন্ড পাবলিশিং হাউস, প্রাঃ লিঃ
১৪১, সুরেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি রোড,
কলিকাতা-১৩

প্রচ্ছদপট :
শিবেন ব্যানার্জি

প্রাপ্তিস্থান :
গ্রন্থ ভারত
৪১-বি, রাসবিহারী এভিনিউ
কলিকাতা-২৬

কথাশিল্প :
১৯, শ্যামাচরণ দে স্ট্রীট
কলিকাতা-৯

মূল্য : তিন টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা

লেখকের অন্যান্য বই ঃ

উপন্যাস ঃ

জনপদবধূ
দেবকন্যা
এ-জন্মের ইতিহাস
নীলসিন্ধু
সীমাস্বর্গ
জলকন্যার মন
মধ্যদিনের গান
তীরভূমি
বিদিশার নিশা
শ্বেতকপোত
এই তীর্থ
নতুন নাম নতুন ঘর
কতো আলোর সঙ্গ
দুই নদী
শান্তির স্বাক্ষর

গল্পগ্রন্থ ঃ

নীলাঞ্জনছায়া
সিন্দুর টিপ্
এক আশ্চর্য মেয়ে
একটি রঙ্-করা মুখ

নাটক ঃ

পথ

প্রকাশকের অন্যান্য গ্রন্থ ঃ

রূপদর্শী ঃ ব্রজবুলি
চেনামুখ

সুভাষ মুখোপাধ্যায় ঃ যখন যেখানে

ডাঃ আনন্দকিশোর মুন্সী ঃ পরম লগনে

বিমল কর ঃ এই দেহ অন্য মুখ

প্রমথ চৌধুরী ঃ রবীন্দ্রনাথ

যন্ত্রস্থ ঃ

বিমলাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় ঃ অন্য ভুবন

সাগরময় ঘোষ ঃ দণ্ডকারণ্যের বাঘ

সমরেশ বসু ঃ [illegible]াচারিণ।

শ্রীঅজিতমোহন গুপ্ত

সুহৃদবরেষু

আমার নাম প্রমোদ সরকার। আমাদের গ্রামের হাজী নাকু মহম্মদ হাইস্কুল বলে যে স্কুলটিতে আমি লেখাপড়া করেছি, সেই স্কুলেরই বাংলার শিক্ষকমশাই বলতেন,—প্রমোদ নয়, প্রমাদ। ও হচ্ছে বিধাতার বিশ্ব-গ্রন্থের এক মুদ্রণ-প্রমাদ।

কথাটায় তখন মনে মনে রাগ করতাম, সহপাঠীরা ঠাট্টা করলে বিরক্ত বোধ করতাম, কিন্তু আজ সেই শিক্ষক মশায়ের মুখখানাই বারবার ভেসে উঠছে চোখের সামনে। শুনেছি তিনি আর ইহজগতে নেই। ইহজগতে তো অনেকেই নেই, আমার বাবা নেই, বড়দিদি নেই, আছে মা আর ছোট একটি বোন। মেজো বোনের বিয়ে হয়ে গেছে সেই কবে, সে আছে তার স্বামীর সংসারে—বালুরঘাটে। আর আছে আমার কাকারা-কাকীমারা, তবে তাদের গৃহস্থালী হয়ে গেছে ভিন্ন।

ঘর-মাঠ-বাগান যা আছে, তাতে আমার মা-বোনের একরকম চলেই যায়,—কিন্তু 'একরকম' করে চলাটাই তো সব নয়, তাই মেজো কাকা আমাকে বেশ ভালো করেই বুঝিয়ে দিয়েছিলেন, চাকরী করা দরকার। মেজো, সেজো, ছোট কাকাদের যার যার নিজেদের বাড়ী রয়েছে, একান্নবর্তী আমরা নই, তবু বাবার মৃত্যুর পর, আমার মায়ের মনোভাব অনুযায়ী আমার অভিভাবক হয়ে দাঁড়ালেন ওঁরাই। অতএব, ওঁদের পরামর্শ অস্বীকার করা অত সহজ ছিল না, অন্ততঃ সেই আমার প্রথম বয়সে। তাই

স্কুলের পালা শেষ হয়ে যাবার পর, পরবর্তী ধাপে পা না দিয়ে চাকরির সন্ধানেই উন্মুখ হলাম।

এ-ও এক প্রমাদ আমার জীবনে, কিন্তু তখন তা' বুঝতে পারিনি। মেজোকাকাই আমার ব্যাপারে মাথা ঘামাতেন বেশী, মাকে এসে একদিন বললেন—ছেলে তোমার লায়েক হয়ে উঠেছে বৌদিদি, বাগানে গাছতলায় লুকিয়ে লুকিয়ে বসে নভেল পড়ছে।

একটু দূর থেকে শুনলাম কথাটা। ছোট বোনটিও ছিল কাছে, সে কাকার সুরে সুর মিলিয়ে বলে উঠল—হ্যাঁ মাও, কত বই, বাসে করি যায়া শহর থাকি নিয়া আইসে। আর, জানিস মাও?

—কী?

ফিসফিস্ করে মা-র কানে কানে বললে—দাদা চুপ চুপ করি পগু ল্যাখে। খাতা দেখবু?

বেশ মনে আছে মা রীতিমত শঙ্কিত হয়ে উঠেছিল কথাটা শুনে। মেজোকাকার সঙ্গে আমাদের গাজোল থানার দারোগা মিত্তিরসাহেবের সঙ্গে আলাপ ছিল, তাঁকে বলে-কয়ে ঢুকিয়ে দিলেন আমাকে চাকরিতে, আমি হলাম মাথায় লালপাগড়ী এক কনস্টেবল। (অবশ্য লালপাগড়ীটা কথার কথা, আজকাল আমাদের ওদিকে কনেস্টবলের মাথায় উঠেছে একরকমের টুপি।)

কাকা বললেন—এইভাবে ঢুকে পড়। তারপরে এল-সি, তারপরে এ-এস-আই।

আগেই বলেছি, এ-ও এক প্রমাদ। তারপরে, এক-দুই নয়, সাত বছর কেটে গেল, যা আছি তা-ই রয়ে গেলাম, না হলাম এল-সি, না হলাম এ-এস-আই,—একবার গাজোল, একবার ইংরেজবাজার, একবার দেওতলা আউটপোস্ট, এই করে বেড়াচ্ছি। আর এইভাবে বেড়াতে বেড়াতেই একদিন হঠাৎ

আরও এক প্রমাদের সম্মুখীন হলাম। থানার দারোগা তখন আর মিত্তিরসাহেব নন। তিনি বদলী হয়ে গেছেন, এসেছেন খাঁ সাহেব, ইয়ুসুফ খান সাহেব।

সেদিন ভোরবেলা। ডেকে বললেন—সরকার, করছ কী? তোমাকে আজ একটা কাজ করতে হবে। সদরে যেতে হবে। চটপট তৈরি হয়ে নাও দেখি।

যথারীতি আদেশ পালন করলাম। চেয়ারে বসে নিজের কাজ করছিলেন খাঁ সাহেব। মুখ তুলে আমাকে দেখে নিয়ে, আমার অভিবাদনের উত্তরে মাথাটা একটু ঝুঁকিয়ে তারপরে বলে উঠলেন—এই টাকাটা তুলিয়ে এনে রেখেছি। ওটা রাখো। কাজে লাগবে।

সদরে আরও কতবার কত কাজ নিয়ে গেছি, কিন্তু নগদ টাকা এভাবে হাতে পেয়েছি বলে ত মনে পড়ে না। দ্বিতীয়তঃ, যে-টাকা টেবিলে রাখা হয়েছে, তা একার পক্ষে যথেষ্ট বেশী। আদেশমত টাকা নিয়ে পকেটে রাখলাম বটে, কিন্তু বিস্ময়ের ঘোর তখনো কাটল না।

সাহেব কিছু কাগজপত্রও দিলেন এগিয়ে, বললেন—এ-ও রেখে দাও। বরং ব্যাগ নাও সঙ্গে। হারায় না যেন, খুব জরুরী।

ঝুলান কাপড়ের ব্যাগটা তাড়াতাড়ি নিয়ে এলাম। রাখলাম তাতে যত্ন করে কাগজপত্রগুলি। তারপরে, জিজ্ঞাসুনেত্রে সাহেবের মুখের দিকে তাকাতেই, তিনি ধারালো গলায় ডেকে উঠলেন—দরওয়াজা।

সাড়া দিয়ে শান্ত্রী ইয়াসিন ঘরে এসে অভিবাদন করে দাঁড়ালো। খাঁ-সাহেব বললেন—কাল রাত্রে যে-মেয়েটিকে সদর থেকে এনে লক্-আপে রাখা হয়েছে, তাকে নিয়ে আসতে বলো।

—জী, সাব।

লক্‌-আপে মেয়ে। কাল রাত্রে এসেছে! আশ্চর্য, কিছুই জানি না তো আমি!

দাঁড়িয়ে আছি স্থির হয়ে কাষ্ঠপুত্তলিকার মত, এমন সময় মহাবীর কনস্টেবল নিয়ে এলো মেয়েটিকে। রোগা ছিপছিপে গড়নের মেয়েটি, ময়লা একটা শাড়ি পরা। মাথায় ঘোমটা, এক নজরে তার মুখখানা ভালো করে দেখতে পেলাম না।

খাঁ সাহেব বললেন—একে নিয়ে যাও সরকার। কয়েদী। পাণ্ডুয়াতে যাবে। ও-ই পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে'খন, ভাবনা নেই। কিন্তু সাবধানে যাবে। অবশ্য, সঙ্গে তোমার মহাবীরও যাচ্ছে।

—ইয়েস স্যার।

কৌতূহল জাগলেও তা নিবৃত্তি করার উপায় নেই। যা উনি বলবেন, মাত্র তা-ই শুনে যেতে হবে, কোনো কিছু ব্যাপার নিয়ে অযথা প্রশ্ন করার রীতি নেই। সেটা নিয়মবিরুদ্ধ।

অভিবাদন জানিয়ে চলেই আসছি, খাঁ সাহেব পিছন থেকে ডেকে বললেন—শোনো। মেয়েটির বাড়িতে ঘড়ি ধরে মাত্র এক ঘণ্টা সময় দেবে। এক মিনিটও যেন তার বেশী না হয়, খবরদার। তারপরে ওখান থেকে বেরিয়ে তুমি মেয়েটিকে নিয়ে যাবে সদরে। মহাবীর ফিরে আসবে গাজোলে। ঠিক আছে?

—ইয়েস স্যার।

—আরো শোন,—খাঁ সাহেব বললেন—সদরে গিয়ে থানার অফিসারের সঙ্গে দেখা করবে। তারপরে, তিনি যদি বলেন, ত মেয়েটিকে নিয়ে চলে যাবে একেবারে মালদহ জেলে। সেখানে ওকে দিয়ে কাগজপত্র সব জেলার সাহেবকে বুঝিয়ে চলে আসবে।

খাওয়াটা সদরে-ই সেরে নিও, টাকা রইল। ওকেও খাইয়ো দরকার হলে। কেমন ?

—ইয়েস স্যার।

—যাও।

তারপরে মেয়েটির দিকে ফিরে বলে উঠলেন খাঁ সাহেব—এদের সঙ্গে যাও, কিন্তু খবরদার, পালাবার চেষ্টা করবে না।

মেয়েটি মুখ নীচু করল।

হ্যাঁ, না, কী বলল, ঠিক বুঝলাম না। কিন্তু এরই মধ্যে এটুকু বুঝলাম, মেয়েটির বয়স যদি খুব বেশি হয়, ত চব্বিশ-পঁচিশ। এর বেশি নয়। চোখমুখ বসে গেছে, ক্লান্ত, বিষণ্ণ চেহারা, তবু মনে হয়, গায়ের রঙটা ফরসারই দিকে। সিঁথিতে সিঁদূর আছে কি নেই বোঝা যাচ্ছে না। তবে একটি হাতে একগাছি লোহা আর শাঁখা দেখে এটুকু বুঝতে পারলাম, মেয়েটি কুমারী নয়, সধবা।

চলতে চলতে ততক্ষণে দারোগার ঘরের দরজার কাছে এসেছি, হঠাৎ পিছন থেকে কানে এল খাঁ সাহেবের প্রচণ্ড ধমক—কয়েদী কী করে নিয়ে যেতে হয়, জানো না ?

আমি আগে, মেয়েটি পিছনে, তারও পিছনে ছিল মহাবীর। বুঝলাম, ধমকটা মহাবীরেরই উদ্দেশ্যে।

থমকে দাঁড়ালাম, ঘুরলাম। দেখি, মহাবীর সন্ত্রস্ত হয়ে হাতের দড়িটা মেয়েটির কোমরে পরিয়ে দিচ্ছে। দড়ির একপ্রান্ত থাকবে তার নিজের হাতে।

আমি এধার থেকে দেখতে লাগলাম, দড়ি পরানোর পালা শেষ হতেই মেয়েটির দুটি চোখ ভরে উঠল জলে। ডাগর ডাগর

চোখদুটি ছলছল করে উঠল তার। একটিবারের জন্য আমার মুখের দিকে মুখ তুলে তাকাল, কেন কে জানে—তারপরেই নামিয়ে নিলো। শুরু হলো আমাদের চলা।

থানার সীমানা ছাড়িয়ে খানিকটা হেঁটে আসবার পর, পিচের বড়ো রাস্তা, মালদহ-দেউতলা বাস-রুটের রাস্তা, একেবারে পশ্চিম দিনাজপুর পর্যন্ত চলে গেছে। কিন্তু, সে রাস্তায় পড়বার আগেই, আশেপাশে ভীড় এমন জমে গেল যে, মহাবীর থমকে থেমে হাঁকডাক করে তাদের সরিয়ে দিতে বাধ্য হলো।

তবু কি তারা যায়? দূরে দূরে আমাদের সঙ্গী হয়ে জনকয়েক লোক চলা শুরু করলই। বউটি মাথার ঘোমটা আরও টেনে দিয়েছে, মুখ দেখবার উপায় একেবারেই নেই।

মহাবীর বললে—ওহে সরকার, যাবে কী ভাবে? কোন্ না পনেরো মাইলের বেশি পথ!

বললাম—কেন, বাস-এ যাই?

—বাস তো একখানা এইমাত্র গেল। বসে থাকো এখন, যার নাম আধঘণ্টা তিন কোয়ার্টার।

—তা বসলামই বা!

—ভীড় জমবে না মাছির মতো? কাঁহাতক তাড়াবে!

মেয়েটির আনত মুখখানির দিকে তাকিয়ে সত্যিই একটু মায়া হলো। কে এই মেয়ে, কিসের কয়েদী, কিছুই জানি না, পাণ্ডুয়ার গ্রামে যেতে হবে কেন তা-ও জানি না। ব্যাগের কাগজপত্রে এর হদিস মিলতে পারে, কিন্তু সে সব দেখা ত আমাদের বারণ, মহাবীর আছে, যদি খাঁ সাহেবের কানে তুলে দেয়?

মহাবীর ততক্ষণে আমার পাশে এসে দাঁড়িয়েছে মেয়েটিকে পিছনে রেখে। মহাবীর বিহারী, কিন্তু বহুদিন এ অঞ্চলে আছে,

বাংলা বলে চমৎকার। কণ্ঠস্বর নামিয়ে বললে—পয়সা বাঁচিয়ে কী হবে, মেয়ে কয়েদী, কষ্ট হচ্ছে না? তার চেয়ে, তাহেরের গাড়িখানা জুততে বলি, কমে-সমে হয়ে যাবে'খন। কী বলো?

—বেশ।

—চলো, বড় রাস্তায় না গিয়ে গাঁয়ের দিকে যাই, তাহেরের বাড়ি পড়বে। গাড়িটা ঐখান থেকেই রাস্তায় নামানো যাবে।

—তাই চলো।

গতিপথ পরিবর্তিত করে গ্রামের দিকেই চললাম আমরা। ভীড় কিন্তু সমান জুটে যাচ্ছে, তবে, আমাদের তাড়ার ভয়ে একটু দূরে দূরে। তাহেরের বাড়ি খুব কাছে নয়, প্রায় ক্রোশখানেক হেঁটে হেঁটে যেতে হলো, কখনো পায়ে-চলা পথে, কখনো বা মাঠের আল ডিঙিয়ে। মাঠে পড়বার পর ভীড় আর ছিল না, তখন আমরা তনজন মাত্র। দু-একটা কুকুর শুধু পাশ থেকে চিৎকার করছে আমাদের দেখে।

মহাবীর বললে—কী গো মেয়ে, কষ্ট হচ্ছে নাকি হাঁটতে?

মেয়ে কোনো উত্তর দিল না। মহাবীর বিদ্রুপের ভঙ্গিতে বলে উঠল—লজ্জাবতী লতা যে! তা কয়েদ হলো কেন? শ্বশুরবাড়ি এলে গাজোলে, কিন্তু সে বাড়িতে ত ঢুকতেই পারলে না, দূর দূর করে তাড়িয়ে দিলে। তখন, ভরসার মধ্যে ঐ—থানা।

মেয়েটি এবারেও কোনো কথা বললে না। মহাবীরের কথা শুনে আমি কিন্তু একটু অবাকই হলাম। মেয়েটিকে সামনে এগিয়ে দিয়ে, আমি এলাম মহাবীরের পাশাপাশি। মেয়েটির কোমরের দড়ি ওরই হাতে।

বললাম— ব্যাপারটা কী, বলো ত মহাবীর ?

মহাবীর বললে—সে কি আমিই জানি ? মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করো, রা-টুকুও করবে না। রাত্রে সদর থেকে নিয়ে আসা হলো ওকে, আমিই ত আনলাম, শেষ বাসটি ধরে। এটুকু সদর থানা থেকেই শুনেছিলাম, মালদহ জেল থেকে আনা হচ্ছে মেয়েটিকে। যাবে গাজোল, ওর শ্বশুরবাড়ি। ম্যাজিস্ট্রেটের হুকুম। সে-ও এই পথে, যে পথে আমরা যাচ্ছি, বঙ্গালপাড়ার কাছে।

—বঙ্গালপাড়া !

বিস্ময়ের বিদ্যুৎস্পর্শে থরথর করে কেঁপে উঠল সর্বাঙ্গ। বঙ্গালপাড়া ! কে এই মেয়েটি তবে ?

আমি নিজে বঙ্গালপাড়ার লোক, নিজে বঙ্গাল, অর্থাৎ রাজ-বংশী। ছোটবেলায় বাবার কাছে শুনতাম, যে-বংশ থেকে কোচবিহারের রাজপরিবারের উদ্ভব, আমরা, রাজবংশীরা, সেই পরিবার থেকেই উদ্ভূত। সমগোত্রীয় কোচ ও পলিয়াদের থেকে আমাদের মর্যাদা বেশি। আমাদের মধ্যে অনেকে পৈতে পর্যন্ত ধারণ করেছে, যদিও আমরা প্রধানতঃ কৃষিজীবি। আমার কাকাদের পৈতে আছে, আমারও আছে।

কিন্তু এ গেল আমাদের কথা, এই মেয়েটির শ্বশুরবাড়ি যদি বঙ্গালপাড়ায় হয় ত, ও আমাদেরি গ্রামের কোনো বউ। অথচ গ্রামের বউ হলে আমি কি একনজরে চিনতে পারতাম না ! না-ও পারতাম, গ্রামে মা থাকে, বোন থাকে, আমিও সুযোগ মতো এসে থাকি, কিন্তু অধিকাংশ সময়টাই ত আমার যায় থানাতে, আর থানার কাজে। পাড়াপড়শীদের চেনবার মতো অবকাশ আমার সত্যিই কোথায় তেমন ?

সঙ্গে সঙ্গে এ-ও মনে হল, মেয়েটির কয়েদ হলো, নিশ্চয়ই

কোনো সাংঘাতিক ব্যাপার। অথচ গ্রামে সাংঘাতিক কোনো ব্যাপার ঘটে গেল, আমি তা জানতে পারলাম না?

অবশ্য আমার পক্ষে না জানাটা খুব আশ্চর্যের কথা নয়, যেটুকু সময় পাই, কথা চালাচালির মধ্যে থাকি না, বাগানে গিয়ে গাছতলায় বসে বই-পড়ার প্রচণ্ড নেশাটা এখনো আমার আছে। ঘরে বসে যখন পড়ি, তখনো তা ঐ গাছতলায় বসারই সামিল, আশে পাশে কী হচ্ছে না হচ্ছে, সেদিকে লক্ষ্যই থাকে না। তা না হলে, রাত্রে কয়েদী এলো, তাও মেয়ে কয়েদী, থানার কনস্টেবল হয়ে এটুকু সংবাদও রাখব না?

চলতে চলতে ততক্ষণে আমরা মাঠ পেরিয়ে গাঁয়ে এসে পৌঁছেছি। ছেলেছোকরার দল পুলিস দেখে কৌতূহলী হয়ে পথের দুপাশে জড়ো হচ্ছে, অথচ, সাহস করে কাছে আসছে না। মেয়ে কয়েদী দেখে, এ বাড়ি সে বাড়ি থেকে বউ-ঝিরা উঁকি-ঝুঁকি দিতে লাগল। মেয়েটির মুখ কিন্তু দেখা যাচ্ছে না, একগলা ঘোমটা টেনে দিয়েছে সে তখন।

আর কিছুটা হাঁটবার পরই রাস্তা ডাইনে-বাঁয়ে দুদিকে ভাগ হয়ে গেছে। আমার অতি পরিচিত পথ। ডানদিকে ঘুরে ক্রোশখানেক গেলেই পড়বে বঙ্গালপাড়া, আমাদের বাড়ি। দাঁড়িয়ে পড়লাম, বললাম—মহাবীর!

—কী?

—সদরে যাচ্ছি, মা-বোনের সঙ্গে দেখাটা করে যাবো নাকি?

—তা মন্দ কী? কিন্তু মেয়েটিকে হাঁটাবে?

বললাম—উপায় কী? এ পথে চৌদোলা পাবো কোথায়?

চৌদোলা শব্দটার মধ্যে একটা শ্লেষ আছে, সেটা ঠিক গিয়ে

খিঁচেছে যথাস্থানে। মেয়েটি দুটি বড়ো-বড়ো চোখ তুলে একবার আমার দিকে তাকালো, তারপরেই নত করল মুখ।

বললাম—সকাল থেকে ত পেটে পড়েনি কিছু, আমার বাড়িতে গেলে যাহোক কিছু মুখে দেওয়া চলতো।

মেয়েটি তবু দাঁড়িয়ে রইল নিরুত্তরে।

মহাবীর বললে—ঐ যে বললাম, মুখে রা-টি নেই। টেনে হিঁচড়ে নিয়ে চলো তোমার বাড়ি। যাবে না মানে? খাটছে কয়েদ তার আবার অতো কিসের গুমোর?

আমিও তাড়া দিয়ে বললাম—চলো।

মেয়েটি নড়ল না।

—যাবে না?

মেয়েটি এবার মাথা নেড়ে জানালো—না।

বললাম—মেঘলা মেঘলা দিন, রোদ্দুর খরা নয়, আস্তে আস্তে হাঁটা যাবে। কী, কস্ট হবে হাঁটতে?

মাথা নেড়ে এবারেও জানালো— না।

—তবে?

মেয়েটি আবার মুখ তুলল আমার দিকে, বললে—ওদিকে আমার শ্বশুরবাড়ি।

সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারলাম ব্যাপারটা। শ্বশুরবাড়িই তো আনা হয়েছিল ওকে, কিন্তু ওরা তাড়িয়ে দেওয়ায়, ওকে চলে আসতে হয়েছে তৎক্ষণাৎ।

বললাম—ঠিক আছে, যেতে হবে না।

বলে মহাবীরের দিকে ফিরলাম, বললাম—চলো। তাহেরের বাড়ি ঐ ত দেখা যাচ্ছে। গাড়ি বেরিয়ে যায়নি ত?

—নাঃ! এতো সকালে যাবে কী?

অনুমান ঠিকই করেছে মহাবীর। তাহেরকে পাওয়া গেল। পুলিশ দেখে অবিশ্বাস্য রকম অল্প টাকাতেই সে রাজী হলো আমাদের নিয়ে যেতে। ভালো করে ছই লাগিয়ে, বসবার জায়গায় খড় বিছিয়ে, গাড়িতে তার ঘোড়াটাকে জুতিয়ে, আমাদের নিয়ে সে এসে পড়ল একেবারে বড় রাস্তায়। খট খট করে পিচের রাস্তার ওপর ক্ষুরের আঘাত করতে করতে মধ্যম লয়ে চলা শুরু করল তাহেরের ঘোড়া।

মেয়েটি একেবারে পিছনে ছইয়ের প্রান্তে ফেলে-আসা পথের দিকে মুখ করে বসে আছে, তার পাশে আমি, মহাবীর বসেছে তাহেরের কাছাকাছি, একটা বিড়ি ধরিয়েছে সে আরাম করে।

কিছুক্ষণ স্তব্ধতার মধ্য দিয়ে কাটবার পর আমি বললাম—বঙ্গালপাড়ায় তোমার শ্বশুর কে ?

কোনো উত্তর নেই।

মহাবীর বললে—মুখে ছিপি দিয়েছে, ছুটো একটা চড়-চাপড় না দিলে বোল ফুটবে না মুখে।

—কী বলছ তুমি !—একটু রাগত স্বরেই বলে উঠলাম মহাবীরকে—মেয়েছেলে না ?

—ঈস্‌, কয়েদী, তার আবার ব্যাটাছেলে-মেয়েছেলে ! জিজ্ঞেস করো না, কয়েদ হলো কেন ?

মহাবীরের দিকে ফিরে তাকেই প্রশ্ন করে বললাম—কয়েদ হলো কেন ?

মহাবীর বললে—আমি কী করে জানব ? কাল ত জিজ্ঞেস করে করে হয়রান হয়ে গিয়েছিলাম।

মুখখানা ফিরিয়ে আছে পথের দিকে, মাথার দিক থেকে একটু সরে গেছে ঘোমটা-টা, লোকজন যা চলাচল করছে, তাদের মধ্যে

কেউ কেউ ঘন ঘন তাকাচ্ছে ছইয়ের দিকে, আর তারপর পুলিসের সঙ্গে মেয়েটিকে দেখে, অবাক হয়ে যাচ্ছে একেবারে।

তাহের ঘোড়াকে তাড়না করে গাড়িটা একটু জোরে ছুটিয়ে দিয়ে বলে উঠল—যাবো কোথায় পাণ্ডুয়ার ? আদিনার কাছে, না, একলাখীর কাছে ?

মহাবীর বললে—কী মেয়ে, কোথায় ? বলবে ? না, এবারেও পাথরের মতো বসে থাকবে ?

মেয়েটি মুখ ফেরালো, বললে—আদিনার রাস্তা দিয়েই যেতে হবে। একলাখীর দিকে। গাড়ি চলুক, সময় মত আমি বলে দেবো'খন।

মহাবীর একটু হেসে বললে—পাখীর মুখে এই ত বোল ফুটেছে দেখছি ! যাচ্ছি কোথায় বলো তো ? কার বাড়ি ?

মেয়েটি মুখ ফেরালো অন্য দিকে, মহাবীরের কথায় কোনো উত্তর দিলো না সে।

গাড়ির গতি আবার একটু শ্লথ হয়ে গেছে। কয়েকটা ঝাঁকি, কয়েকটা বাঁক। এর পরে, আম্রবীথির ছায়ায় ঢাকা পথটি নির্জন। ঋজুভাবে চলে গেছে দূরে, বহু দূরে।

আস্তে, কণ্ঠস্বর নামিয়ে বললাম—নাম কী তোমার ?

পথের দিকে তাকানো মুখখানি ফেরালো আমার দিকে, আবারও মনে হলো বড়ো বিষণ্ণ, বড়ো ক্লান্ত একখানি মুখ, বড়ো-বড়ো দুটি চোখে অদ্ভুত এক মায়া।

নাম সে আমাকে বলল না, কিন্তু মুখের দিকে তাকাতে-তাকাতে হঠাৎ আমার মনে হলো, মেয়েটিকে কোথায় যেন দেখেছি, ওর ঐ বড়ো বড়ো চোখ তুলে তাকানোর ভঙ্গিটা বুঝি আমার ভয়ানক চেনা।

অথচ, কিছুতেই মনে পড়ছে না, কোন্ বাড়িতে ওকে দেখেছি, কোন্ বাড়ির বউ—ও ? সঙ্গে সঙ্গে এ-ও মনে হচ্ছে, এই মেয়ে এমন কি অপরাধ করতে পারে, যাতে তার জেল পর্যন্ত হয়ে যায় ! কারুর কোথাও কোন ভুল হয়নি ত ? ভুল করে অন্যের অপরাধ নিজের ওপর নিয়ে শাস্তিভোগ করছে না ত মেয়েটি ? এরকম মারাত্মক ভুলের কাহিনী যে না জানা আছে এমন নয়।

আমি আর কিছু প্রশ্ন করার আগে মহাবীরই জিজ্ঞাসা করে উঠলো—হাতে লোহা, সিঁথেয় সিঁদুর নেই কেন ?

এবার স্পষ্ট উত্তর দিলো মেয়েটি—জেলখানায় সিঁদুর দেবে কে আমাকে ?

উৎসাহিত হয়ে উঠল মহাবীর, বললে—পথে এসো ! কথা কইবে না বলে ? তবে হ্যাঁ, কথা কওয়াতে পারা চাই। কী মেয়ে, গাড়ি থামাবো, কিছু খাবে ?

—না।

—না ! কেন ?

মুখ নীচু করে মাথা নেড়ে সেই একই উত্তর দিলো সে—না।

এবারে কথা বললাম আমি। বললাম—খেলে পারতে।

মুখ নীচু রেখেই উত্তর দিলো—খেতে নেই।

—কেন ?

মাথা নীচু করল আরও। লক্ষ্য করে দেখলাম, দুটি চোখ ছলছল করে এসেছে তার।

কী মনে হলো, বলে উঠলাম—মহাবীর !

—কী ?

বললাম—ওর কোমরের দড়িটা খুলে দেবো ? কে আর দেখছে বলো এখানে !

নিস্পৃহ গলায় উত্তর দিলে মহাবীর, বললে—দাও। পালাবে আর কোথায়? শ্বশুরবাড়ীতে ত জায়গা নেই, বুঝলাম। বাকী আছে বাপের বাড়ি। ভালো কথা মনে পড়েছে, ওর বাপের বাড়ি যাচ্ছি না ত আমরা?

আমি ততক্ষণে ওর কোমরের দড়িটা খুলে দিয়েছি। মেয়েটি আরেকবার তাকালো আমার মুখের দিকে, মনে হলো কৃতজ্ঞতায় দুটি চোখের দীপ্তি যেন কোমল হয়ে এলো মুহূর্তের জন্য।

মহাবীর বললে—নিশ্চয়ই কোন গুরুতর ব্যাপার। নইলে, জেলের কয়েদীকে ম্যাজিস্ট্রেট-সাহেব বাইরে আসতে হুকুম দেয়? কিন্তু, জেলের বাইরে ওকে নিতে ওর বাড়ির কেউ এলো না কেন? নাকি, নিয়ম নেই? জানি না বাপু। হ্যাঁ মেয়ে, তোমার বাপের বাড়ি যাচ্ছি নাকি আমরা?

এবারে উত্তর দিলো মেয়েটি—হ্যাঁ।

—তাই বলো! এটা বলোনি কেন?

মেয়েটি চুপ করে আছে। মহাবীরকে বললাম—ওকে অমন করে বিরক্ত ক'রো না মহাবীর।

—আহা, বিরক্ত করছি কোথায়! হ্যাঁ মেয়ে, বিরক্ত হচ্ছো?

মাথা নেড়ে মেয়েটি জানালো—না।

মহাবীর খুশী হয়ে আমার দিকে তাকিয়ে বললে—দেখলে?

—তা হোক—বললাম—বেচারী খায়নি-দায়নি কিছু, বকবক করে ওর মাথা খারাপ করে দিও না।

—কী বললে! মাথা খারাপ করে দিচ্ছি!—বলে হো-হো করে হেসে উঠল মহাবীর, তারপর বললে—জেলে থাকতে হতো একেবারে একা। এখন তবু আমাদের পেয়ে কথা বলার সুযোগ পাচ্ছে। কী মেয়ে, ভালো লাগছে না আমাদের?

মেয়েটি ঘোরতর লজ্জা পেয়ে মুখখানা ফেরালো অন্য দিকে।

আমি বলে উঠলাম—আঃ! কী হচ্ছে বলে তো মহাবীর?

মহাবীর চোখ ঘুরিয়ে ভঙ্গিভরে বললে—ও, তোমারও পছন্দ হচ্ছে না আমার কথা! এই আমি কুলুপ দিলাম মুখে।

তাহের ততক্ষণে ঘোড়াকে আবার তাড়না করে তার রথের গতি বাড়াবার চেষ্টা করছে—এই হট্ হট্!

কিছুক্ষণ সত্যিই আর কথা নেই। নির্জন পথে অশ্বক্ষুরের শব্দই শুনে চলেছি কিছুক্ষণ।

আমাদের পাশ দিয়ে একটা জীপ গাড়ি বেরিয়ে গেল হুশ করে। তারপর কিছুক্ষণ পরে যাত্রীবাহী একটা বাস, যাচ্ছে বুনিয়াদপুর হয়ে, হয় রায়গঞ্জ, নয় বালুরঘাট।

মহাবীর চুপ করে থাকবে কতক্ষণ? বললে—পথ আর ফুরোয় না। তাহের, একটু জোর কদমে চলো না ভাই।

—চেষ্টা ত করছি হুজুর! বলে, তাহের মুখে একটা শব্দ করে ঘোড়াকে তাড়না করলে। কিছুটা ফল অবশ্য হলো, কিন্তু কিছুক্ষণ চলার পর ঘোড়া আবার যে-কে-সেই। সেই মন্থর গতি।

মহবীর বললে—সদরের কাজেরও বলিহারী। কয়েদী পাঠাচ্ছিস, প্রিজ্‌ন-ভ্যানে পাঠা! না, সেটা অন্য জরুরী কাজে ব্যস্ত, প্রাইভেট গাড়িতে নিয়ে যাও। তা-ও যদি বা পাঠালি, তোদের জেলের শাস্ত্রী পাঠিয়ে দে! তা না মালদ'র সাব-জেলে লোক কম, পুলিসের হেফাজতেই পাঠাতে হবে। জেল থেকে সদর থানা, সেই থানা থেকে গাজোল থানা, কয়েদীকে নিয়ে এ টানাহ্যাঁচড়া কেন বাপু? কর্তার ইচ্ছায় সব কর্ম, বুঝলে না? আইনও নেই, কানুনও নেই।

একটু হেসে মহাবীরের দিকে ফিরে নিম্নকণ্ঠে বললাম—কানুন খুড়ো তুমিই মেনেছ। বড়ো হুজুরের ধমক খেয়ে তুমি যে তাড়াতাড়ি তখন মেয়ে কয়েদীর কোমরে দড়ি দিলে, সেটা কী ঠিক হয়েছে। মেয়েটি কিসের কয়েদী, তুমি জানো? যদি বিনাশ্রমের কয়েদী হয়? সশ্রম কয়েদীদেরও কোন-কোন ক্ষেত্রে দড়ি পরানোর রীতি নেই শুনেছি। তাছাড়া, ওকে তো তুমি গ্রেপ্তার করছ না—ও হচ্ছে মেয়াদ-খাটা জেলের কয়েদী।

তাচ্ছিল্যের স্বরে মহাবীর বলে—যাও যাও, তুমি আর কানুন শিখিও না। সেদিনকার ছোকরা, বয়স আঠাশ পেরিয়েছে কিনা সন্দেহ!

মেয়েটির দিকে অপাঙ্গে একটু তাকিয়ে নিয়ে ঈষৎ লজ্জিত কণ্ঠে বলে উঠলাম—কী মুশকিল। বয়সের কথা উঠছে কেন? পুলিসের আবার বয়স কী? উর্দি পরলে আঠাশও যা, আটত্রিশ ও তাই।

মহাবীর বললে—এটা মন্দ বলোনি, কিন্তু ওটা বললে কী! সাহেব দাবড়ি দিলে কনস্টেবল করবে কী? একটা কিছু তো তক্ষুনি করে ফেলা দরকার! এতদিন চাকরি করছ, এটা নিশ্চয় শিখেছ? তাই, কী আর করবো, দড়িটাই পরিয়ে দিলাম। কিন্তু, দেখলে ত, সাহেব কিছু বলল না তাতে!

—সেটা সাহেবের মর্জি! নইলে, বেরুবার সময়, আমি সামনে, মেয়েটি মাঝে, পিছনে তুমি, এইভাবেই তো চলার নিয়ম। মনে করে দেখ, তুমি কী করেছিলে? মেয়েটির একেবারে পাশাপাশি। সাহেব সেই জন্যই দিয়েছিল ধমকটা। তুমি বোঝনি।

মহাবীর অসহিষ্ণু কণ্ঠে বলে উঠল—নাও বাপু, থামো, আইনের কচকচি আর ভালো লাগে না।

একটু হেসে নিম্নকণ্ঠেই বললাম—মহাবীর, রাত্রে কী করেছিলে, দড়ি দিয়েছিলে কোমরে মেয়েটির ?

—আরে না-না ! এমন কয়েদী, সদর থানার বড়সাহেব কাগজপত্র দেখে বললে, এক কনস্টেবলই যথেষ্ট।

বললাম—তা তুমিই ভার পেলে কাজটার ?

—কপাল ! মহাবীর বললে—গেছি জরুরী কাগজপত্র নিয়ে শহরে, কাজ সেরে ফিরে আসব, তা' না, জুটে গেল এই আপদ।

—আপদ কেন হবে। হাসতে হাসতেই বললাম—মেয়ে-কয়েদী সঙ্গী পেয়ে তোমার ত খুশী হওয়াই উচিত ছিল।

মুখ বিকৃত করে মহাবীর বললে—খুশী হও গে তুমি। আমার প্রাণে অতো রস নেই ! কয়েদী—কয়েদী ! মেয়ে-পুরুষ বুঝি না, হুকুম করব, মানবে না তো দেবো ঘাড়ে রদ্দা।

একটু বিস্মিত হয়েই বলে উঠলাম, অবশ্য নীচু গলাতেই—দিয়েছিলে নাকি একেও দু-একবার—?

—তা দেবো বইকি ! মহাবীর বললে—এতো কথা জিজ্ঞাসা করেছি, একটিরও কী উত্তর পেলাম ! রাগ হয়ে যায় না ?

মুখ ফিরিয়ে আবার সরে বসলাম মেয়েটির দিকে। কোনদিকে ভ্রুক্ষেপ নেই তার, ভঙ্গী দেখে মনে হলো, আমাদের কথাবার্তা শোনবারও চেষ্টা করেনি সে, সমানে পথের দিকে চেয়ে আছে, বুঝি বা তৃষ্ণার্ত দুটি চোখ মেলে।

মহাবীর বললে—আমার কথার তো উত্তর দেবে না। তুমি জিজ্ঞাসা করো ত, কতদিনের কয়েদ হয়েছে ?

—থাক।

—থাক কেন ? জিজ্ঞাসা করো না ?

মেয়েটিকে প্রশ্নে প্রশ্নে বিব্রত করার ইচ্ছা আমার আদৌ

ছিল না, তবু মহাবীরের পীড়াপীড়িতেই প্রশ্ন করতে হলো। মেয়েটি সেই আগের মতই তাকালো। ডাগর ডাগর দুটি চোখ আমার দিকে এক মুহূর্তের জন্য তুলে, তারপরে কী আশ্চর্য, ধীর কণ্ঠে উত্তর দিলে—এক বছর।

—এক বছর? মহাবীর বললে—তাহলে খুনখারাপী কিছু নয়, ওসব হলে অতো কম মেয়াদ হতো না।

বলে, একটু থেমে আবার শুরু করলে মহাবীর—মুখ যখন খুলেছ মেয়ে, তখন বলেই ফেল না সবটা! কয়েদ হয়েছে কেন? কি করেছিলে তুমি?

মেয়েটি এবার ধীর এবং স্পষ্ট গলায় উত্তর দিলে—কিছুই করিনি।

—কিছুই করো নি! মহাবীর শ্লেষের সঙ্গে বললে—এ যে উকিলে শেখানো আসামীর প্রথম কথা কওয়ার মতো হয়ে গেল—আমি নিরপরাধ হুজুর!

মেয়েটি আর কোনো কথা না বলে মুখখানা ফিরিয়ে রইল পথের দিকে। পথপ্রান্তের বৃক্ষরাজি একের পর এক সরে যাচ্ছে, চোখের সামনে থেকে, তারই দিকে অলস দৃষ্টি মেলে বসে রইল মেয়েটি।

বললাম—এ কথা কিন্তু আমার আগেই মনে হয়েছিল।

মহাবীর বললে—কী কথা?

—মেয়েটি 'নিরপরাধ। কোথাও কিছু একটা ভুল হয়ে থাকবে।

—ঈস্—ঠোঁট ওলটালো মহাবীর, বললে—আদালত বলে কথা! ভুল হওয়া অত সহজ নয়।

—হতেও ত পারে! হয় না কী?

মহাবীর বললে—তোমার যতো নভেল-পড়া বিদ্যে! ঐ

জন্যই কিছু হলো না। থানায় লেখাপড়ার কাজও যে না করতে হয় তোমাকে এমন নয়, তবু এতদিনে একটা প্রমোশনও নিতে পারলে না।

একটু হেসে বললাম—কেন, বিদ্যের দোষ আবার কী হলো!

—শুধু বিদ্যে! মহাবীর বললে—বুদ্ধিরও দোষ। নভেল পড়বে, লুকিয়ে লুকিয়ে পদ্য লিখে ব্যারাকের একে-ওকে-তাকে পড়ে শোনাবে, আর জ্বালাবে! এ লোক আবার পুলিশে চাকরি নিয়েছে কেন, তাই ভাবি।

—তা দোষটা হলো কী বলবে তো?

—হলো না? বললে কিনা নিরপরাধ! নিরপরাধই যদি হবে, তাহলে শ্বশুরবাড়ি থেকে দূর দূর করে তাড়িয়ে দেয়? একটা গলদ কোথাও আছে নিশ্চয়। জিজ্ঞাসা করে দেখ!

ফিরলাম মেয়েটির দিকে। সে কিন্তু নির্বিকার। বেলা তখন বেশ হয়ে গেছে, অথচ আকাশটা মেঘলা-মেঘলা, রৌদ্রের প্রখরতা তত বোধ হচ্ছে না, হাওয়া আসছে, যেন ঘুমপাড়ানী হাওয়া, ঝির ঝির করে বইছে, কেমন ঠাণ্ডা-ঠাণ্ডা। দুটি চোখ ভরে বুঝি ঘুম আসতে চায়।

মহাবীরের দিকে মুখ ফিরিয়ে বললাম—ওসব আমি জিজ্ঞাসা করতে পারবো না।

মহাবীর বললে—খুব যে দরদ! মোটেই ভালো নয়। তোমার কাঁচা বয়স—মরবে দেখছি!

মুহূর্তে কানের কাছটা যেন গরম হয়ে উঠল, চট্‌ করে মেয়েটির দিকে একটু তাকিয়ে বুঝে নিতে চেষ্টা করলাম, এ ইঙ্গিতের তাৎপর্য তার মনে কোন প্রতিক্রিয়া ঘটালো কি না! কিন্তু না, সে একেবারে নির্বিকার।

মহাবীরকে নিম্ন কণ্ঠেই বললাম—যা তা বকছ কেন, বলোত!

মহাবীর বললে—তা তো বটেই। আমার কথা এখন 'যা তা' লাগবেই। যার কথা ভালো লাগবে, তার সঙ্গেই না হয় কথা বলো।

রাগ করে বললাম—তোমার মতো যখন-তখন আমি কাউকে বিরক্ত করতে পারি না।

—না হয় একটু করলে! মহাভারত অশুদ্ধ হয়ে যাবে না! —মহাবীর বললে—জিজ্ঞাসা করো তো, মেয়াদ-খাটার আর কতদিন বাকী?

আমি জিজ্ঞাসা করবার আগেই উত্তর দিলে মেয়েটি—আটমাস খেটেছি, আর চারমাস বাকী।

—তবে তো মেরে এনেছ! মহাবীর বলে উঠল—সশ্রম না, বিনাশ্রম?

—সশ্রম।

মহাবীর এবার একটু অবাক হলো, তারপর ফিসফিস করে আমাকে বললে—ভালো বাংলা বলে যে হে! 'সশ্রম' কথাটা বলে তো ফেললে!

তারপরেই গলাটা উঁচুতে তুলে বললে—দিদিঠাকরুণ, কেন কয়েদ হয়েছিল, এবার বলবে কী?

মেয়েটি দাঁত দিয়ে নীচের ঠোঁটটি সজোরে চেপে রইল, কথাটি বলল না।

—ঐ, কুলুপ আঁটল!

মহাবীরের ভঙ্গি দেখে হেসে ফেললাম আমি। ও বললে—হাসলে যে?

বলেই, হঠাৎ ব্যগ্রতার সঙ্গে আমার হাতটা জড়িয়ে ধরলে, বললে—ঈস্! এ কথাটা আগে মনে হয়নি কেন? তোমার ব্যাগটা খোল ত? ওতে তো সব কাগজপত্র রয়েছে!

কথাটা আমারও যে মনে হয়নি তা নয়, কিন্তু খুলে দেখার নিয়ম নেই, এবং মহাবীর যদি সুযোগ বুঝে নালিশ করে দেয়, ত অশান্তির কারণ ঘটতে পারে, তাই চুপচাপ ছিলাম। এবার ওর আগ্রহ লক্ষ্য করে আর থাকতে পারলাম না, ব্যাগ খুলে বার করলাম কাগজপত্র।

কাগজপত্র আর কী! একটা পিওন-বই, তাতে সরকারী একটা খাম, পিয়ন-বুকে শুধু খামের ঠিকানা লিখে দেওয়া। অফিসার-ইন্-চার্জ, সদর থানা। ইত্যাদি। এতে করে মেয়েটির পরিচয় কী পেতে পারি? হতাশ হয়ে বন্ধ করলাম ব্যাগ।

ঠিক সেই সময় তাহের হেঁকে বললে—হুজুররা, আদিনা পেরুচ্ছি।

—কোন্ আদিনা? রেলের স্টেসন?

—না হুজুর, স্টেশন এখান থেকে তিন মাইল দূর।

—তবে?

—হুজুর, আদিনা মসজিদ।

মেয়েটি মাথা ঝুঁকিয়ে দেখতে লাগল প্রবীণ মসজিদের ধ্বংসাবশেষ।

তাহের কিছুক্ষণ পরে আবার বললে—এবার সড়ক ছেড়ে অন্ত রাস্তায় নামছি। একলাখীর দিকে যাবো কী?

মেয়েটিকে জিজ্ঞাসা করলাম—কী বলো? যাবো?

মেয়েটি মাথা নেড়ে জানালো—হ্যাঁ।

তাহেরকে বললাম—তাই চলো।

'হট্-হট্, এই এই!'—বলে সে তার ঘোড়াটাকে তাড়না করলে আবার। উঁচু নীচু রাস্তা এবার, শুরু হলো প্রবল দোলা।

মেয়েটিকে বললাম—কষ্ট হচ্ছে?

—না।

—যাচ্ছ কোথায়? তোমার বাপের বাড়ি তো?

—হ্যাঁ।

মহাবীরের কৌতূহল অত্যুগ্র, প্রশ্ন করলে—কেন যাচ্ছ?

কোনো উত্তর নেই।

—গাজোলের বড় দারোগা কী বলে দিয়েছে মনে আছে তো? মাত্র এক ঘণ্টা সময়।

মাথা নেড়ে মেয়েটি জানালো—মনে আছে সে কথা।

মহাবীর আমাকে বললে—বুঝলে ব্যাপারটা? বাপ-মার সঙ্গে দেখা করতে যাচ্ছে, এক ঘণ্টা সময়। কিন্তু, কথা হচ্ছে জেলের কয়েদীকে এভাবে কেউ ছেড়ে দেয়, না, দিতে পারে?

বললাম—তা হতে পারে। আজকাল আইন-কানুন কতো বদলাচ্ছে, দেখছ না?

—যতোই বদলাক! তা বলে জেলের কয়েদীকে ছুটি দেওয়া! তা-ও আবার ম্যাজিস্ট্রেট সাহেবের বিশেষ হুকুমে।

বললাম—ম্যাজিস্ট্রেটের হুকুম শুধু কেন, জেল-সুপারেরও হুকুম চাই।

মহাবীর বললে—তা-ও হয়ত পেয়েছে।

তারপর বিস্মিত ভঙ্গীমায় নিজেই বললে—নিশ্চয় খুব জরুরী কোনো ব্যাপার। তা না হলে, ঠিক এমনটি হতো না। জিজ্ঞাসা করো না ঠাকরুণকে, হঠাৎ ওভাবে ছুটি পেলো কেন?

করলাম প্রশ্ন—ছুটি পেলে কেন ?

মেয়েটি মুখ ফেরালো বটে, কিন্তু কথা বলতে পারল না, ঠোঁট দুটি একবার কেঁপে উঠল, চোখ উঠল ছলছল করে, এখুনি বুঝি গড়িয়ে পড়বে দুফোঁটা চোখের জল।

বললাম—থাক, বলতে হবে না তোমাকে।

গাড়ির ঝাঁকানি ততক্ষণে বেশ বেড়েছে। পথের বর্ণনায় বাহুল্য এনে লাভ নেই, একলাখী মসজিদ পর্যন্ত ঠিক যেতে হলো না, মসজিদের চূড়াগুলি দূর থেকে দেখা যাচ্ছে, এমন সময় মেয়েটির নির্দেশে গাড়ি পথ পরিবর্তন করে একটা কাদামাটির রাস্তা অবলম্বন করল।

যেতে হলো আরও ক্রোশখানেক। বুঝলাম, ঠিক পাণ্ডুয়া গ্রাম নয়, তবে পাণ্ডুয়ার এক উপান্ত বটে।

এক জায়গায় এসে থেমে যেতে হলো গাড়িকে। তাহের বললে—আর চলবে না।

নামলাম আমরা তিনজনে। নেমে গাঁয়ের পথে শুরু করলাম চলা। বরেন্দ্রভূমির অসমতল মাটি, কোথাও উঁচু, কোথাও নীচু, মাটির রঙও লালচে। আমাদেরি ওদিককার মতো। যতদূর জানি, এ অঞ্চলটা আমাদের গাজোল থানারই অধীনে।

ঘটনাগুলি কাহিনীর পক্ষে অবান্তর, নইলে গাঁয়ের লোকগুলির বিস্মিত-বিহ্বল চাহনি আর কুকুরের ঘেউ ঘেউ, এর একটা বিশদ বিবরণ দেওয়া যেতো। মেয়েটি এ গাঁয়ের মেয়ে, না চেনবার কথা নয় কারুর পক্ষে। কেউ কেউ ছুটে গেল কোন এক বাড়ির দিকে, মেয়েটির পিছনে পিছনে আমরাও চলেছি, আর ভীড় সরাচ্ছি। এমন সময় দেখি, ছুটে এসেছে এক বৃদ্ধ, খোঁড়াতে খোঁড়াতে।

খালি গা, মুখে খোঁচা খোঁচা দাড়ি, লোকটি ঈষৎ খঞ্জ। যেমনভাবে এগিয়ে এসে সে মেয়েটিকে ধরল, তাতে বুঝলাম এই-ই ওর বাপ।

মহাবীর বললে—তোমার মেয়ে?

—হ্যাঁ হুজুর।

—যাও, ভিতরে নিয়ে যাও, আমরা এই গাছতলায় বসছি।

—বসুন হুজুর।

বলা মাত্র শুরু হয়ে গেল হাঁক-ডাক। এই বেঞ্চি নিয়ে আয়, জল নিয়ে আয়। চা করতে বল। পান নিয়ে আয়, তামাক নিয়ে আয়। ইত্যাদি।

বলা বাহুল্য, মেয়েটি চলে গেল ভিতরে। আমরা গাছতলায় পেতে-দেওয়া বেঞ্চিটার ওপরে বসে একটু বিশ্রাম করতে লাগলাম।

যেমন হয়, এদিক থেকে, সেদিক থেকে লোকজন এসে জড়ো হতে লাগল। অবশ্য ছোট ছোট ছেলেমেয়ের দলই বেশী, তা-ও খুব কাছে আসছে না, একটু দূরে দূরে থেকে লক্ষ্য করে দেখছে আমাদের।

বৃদ্ধটি, যিনি মেয়েটির বাবা, বারকয়েক এলেন আমাদের কাছে, গেলেনও ভিতরে। কিন্তু, কিছুক্ষণ পরেই এটা লক্ষ্যে পড়ল, ঠিক বসছেন না তিনি আমাদের কাছে। মনে হলো, যদি কোন কিছু জানতে চেয়ে প্রশ্ন করি, এই আশঙ্কায় এড়িয়ে যেতে চান তিনি আমাদের। আশে-পাশে লোকজন এসে ভীড় করাতেও এ সঙ্কোচ হতে পারে তাঁর। বুঝলাম, ওঁদের সামনে তাঁর মেয়ের বিষয় নিয়ে তিনি আলোচনা করতে চান না।

সেটা বুঝেই একসময় হাঁক দিয়ে উঠে যথাসম্ভব ভীড় সরিয়ে দিলাম। মহাবীর বোধহয় সেটা ঠিক পছন্দ করল না, বললে—তাড়াচ্ছ কেন সবাইকে? জিজ্ঞাসাবাদ করে জেনে নিই ব্যাপারটা।

দৃঢ়কণ্ঠে বলে উঠলাম—না। দরকার হলে মেয়েটির বাপকে জিজ্ঞাসা কর, ওদের নয়।

আমার এ অভাবিত উষ্মা লক্ষ্য করে মহাবীর একটু অবাকই হলো বোধহয়, কিন্তু কিছু আর বলল না।

ততক্ষণে পান এসেছে, তামাক এসেছে, আমরা তারই সদ্ব্যবহার করতে শুরু করলাম।

কেটে গেল কিছুক্ষণ। নীরবেই কেটে গেল। এক সময় বললাম—লক্ষ্য করেছ মহাবীর, যারা কাছ ঘেঁষে এসেছিল, তারা সবই ছেলেছোকরার দল, গাঁয়ের বুড়োরা কেউ আসেনি।

মহাবীর একটু চিন্তিত ভঙ্গিমায় বললে—তা বটে।

বললাম—এরা সমাজে একঘরে টেকঘরে হয়ে পড়েনি ত?

মহাবীর ছোট থেকেই এ অঞ্চলে আছে, সুতরাং 'একঘরে' কথাটার অর্থ তার পক্ষে না-বোঝবার কথা কিছু নয়। কথাটা বুঝেই সে বললে—আজও এসব 'একঘরে' করা হয় নাকি?

—খুবই হয়! বিশেষ করে—

কথাটা শেষ না করেই থেমে গেলাম, তারপরে বললাম—মেয়েটির শ্বশুরঘর যখন রাজবংশী-জাতের, তখন আমাদের ওরা স্বজাত। ওদের ধরন-ধারণ আমি জানি।

—কী জানো?

বললাম—সবই জানি?

—যথা?

বললাম—আমাদের 'রাজা' আছে জানো?

—রাজা!

—হ্যাঁ। আমাদেরকে এসব অঞ্চলে বলে—বঙ্গাল। আমাদের দলপতি আছে, তাদের নাম কখনো হয় মহৎ, কখনো বা মণ্ডল।

নির্বাচন কথাটা বোঝো? ঐ যেমন ভোট হয়, তেমনি আর কী। আমাদের জাতের লোকেরাও মুখে মুখে ভোট দিয়ে দলপতি নির্বাচিত করে। নির্বাচিত দলপতিকেই বলে মহৎ। আর জমির মালিক যারা, তারা যদি দলপতি ঠিক করে দেয়, সেই দলপতিকে বলে মণ্ডল। আজকাল মণ্ডলের সংখ্যা কমে আসছে। তা বিশ জন মহতের ওপরে যিনি নেতা হবেন, তিনি আমাদের জাতের মধ্যে—রাজা।

আগ্রহভরেই শুনছিল মহাবীর।

বললাম—আসল কথা হলো, মেয়ে কয়েদী এলো বাপের বাড়ি, এ-ঘটনাতেও 'মহৎ' এলেন না খোঁজ-খবর নিতে, এ বড়ো আশ্চর্যের কথা নয়?

মহাবীর একটু ভেবে বললে—কিন্তু এ তো সোজা কথা। এ বাড়ির মেয়ে হয়েছে কয়েদী, সেই দোষে এদের 'একঘরে' করা হয়েছে, এ-ও হতে পারে।

—কয়েদী হওয়ার পরে সেটা হয়েছে? না, আগে?

মহাবীর বললে—তাহলে বুঝছ, খোঁজ-খবর নেওয়া দরকার। সবটাই কেমন যেন হেঁয়ালি।

—দাঁড়াও, বৃদ্ধের সঙ্গে আলাপ করি।

কিছুক্ষণ কেটে যাবার পর, বৃদ্ধ ধীরে ধীরে দাঁড়ালেন এসে কাছে। বললাম—বসুন!

কিন্তু বসলেন না।

লোকজন ধারে-কাছে ততক্ষণে আর নেই, দূরে দূরে দুচারটে ছোট ছোট ছেলেপিলে দাঁড়িয়ে আছে, আর বাড়িটার ভিতরে মাথায় ঘোমটা-দেওয়া, ছেলে-কোলে-করা যতো রাজ্যের মেয়েদের ভীড়!

বললাম—আর মিনিট কুড়ি আছে মাত্র সময়।

বিনীত কণ্ঠে বৃদ্ধ বললেন—তার মধ্যেই হয়ে যাবে !

—কী হয়ে যাবে ?—অসহিষ্ণু কণ্ঠে প্রশ্ন করল মহাবীর।

—কাজকর্ম।

—কিসের কাজকর্ম ?

বৃদ্ধ আর কিছু বললেন না, মুখখানা নীচু করলেন।

সেই নত মুখখানার দিকে তাকিয়ে দেখি, বৃদ্ধ আবেগে অভিভূত হয়ে পড়েছেন, চোখদুটিও বুঝি ছলছল করে এসেছে।

বড্ডো মায়া হলো। বললাম—বসুন ?

আর এড়াতে পারলেন না অনুরোধ, ধপ করে বসে পড়লেন বেঞ্চির একপাশে।

বললাম—আপনারা ত রাজবংশী ?

মুখ তুললেন বৃদ্ধ, বললেন—না।

—না !

বললেন—আমরা দেশী। গৌড়দেশী।

বললাম—আমি রাজবংশী। আমাদের সঙ্গে কি আপনাদের সামাজিক আদান-প্রদান চলে ?

বৃদ্ধ একটু অবাক হয়েই আমার মুখের দিকে তাকালেন, 'সামাজিক' 'আদান-প্রদান' এসব কথা আমার মুখে কতোটা মানাচ্ছে, তা যেন একবার অনুভব করে নিতে চাইলেন, তারপরে বললেন—না, তা' চলে না।

—তবে ? আপনার মেয়ের শ্বশুরবাড়ি তো বঙ্গালপাড়া, গাজোল। তাই না ?

বৃদ্ধ একটুক্ষণ থেমে, তারপরে দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললেন—যেটি চলে না, সেটিই চলতে গিয়েছিল বাবা, তাই অতো দুর্ভোগ ! বসো, মেয়েকে এনে দিচ্ছি, সময় বুঝি হয়ে গেল।

বৃদ্ধ উঠলেন। আমি বললাম—মেয়ে এলো বাপের বাড়ি, আপনারা কেউ মেয়েকে আনতে গেলেও তো পারতেন। সঙ্গে সঙ্গে আসতেন এই আর কী।

মহাবীর বলে উঠল—না, তা হবে না। কানুন নেই।

বৃদ্ধের মুখখানা ব্যথায় যেন বিবর্ণ হয়ে উঠল, বললেন—বাবা, সদরে হেঁটে হেঁটে হয়রান হয়ে গেছি। এ-বাবুকে ধরি, সে-বাবুকে ধরি, একে দিয়ে দরখাস্ত লেখাই, তাকে দিয়ে তদ্বির করি। কাজটা শেষ পর্যন্ত হলো, কিন্তু ঠিক সময় মতো হলো না, এই আফসোস।

বলে, একটু এগিয়ে গিয়ে আবার ফিরে দাঁড়ালেন, বললেন—তা বাবা, আমার এখানেই যাতে আসতে পারে, সেই দরখাস্তই হুজুরে পেশ করেছিলাম, তা ওকে গাজোলে পাঠালো কেন?

আমরা এ প্রশ্নের উত্তর দেবো কী? আমরাই বা এসবের জানি কতটুকু? অথচ, নিজেদের অজ্ঞতাও প্রকাশ করা চলে না, তাতে গাঁয়ের লোকের কাছে যে আপ্যায়নের ঘটা কমে যায়, এ আমার সাত বছরের অভিজ্ঞতা।

মহাবীর আমার থেকেও পুরাতন ব্যক্তি, তবু সে উত্তরটা সরাসরি দিতে পারলো না, দিতে হলো আমাকেই।

বললাম, সরকারী ব্যাপার, বোঝেনই তো! এর নিয়ম-কানুনই আলাদা।

বৃদ্ধ বললেন—তিন দিন ধরে ঘর-বার করছি, এই মেয়ে আসে, এই মেয়ে আসে! দেখা নেই। তার ওপরে বাবা, এই বুড়ো হাড়, গত দুদিন ধরে প্রবল জ্বর। দেহটা ভালো নেই। আমার ছেলে নেই, সবই মেয়ে। পুতুল আমার ন' মেয়ে। ওর পরে আরও দুটি। ছোটটির বিয়ে দিতে এখনো বাকী। কী যে হবে!

—পুতুল!

মহাবীরের মুখ দিয়ে কথাটা বেরিয়ে গেল, বোধ করি ওর অজ্ঞাতসারেই। আমি তাড়াতাড়ি বিজ্ঞের মতো বলে উঠলাম—কয়েদীর নাম। নামটাও ভুলে গেলে?

মহাবীর তাড়াতাড়ি সামলে নিলে, বললে—ও হ্যাঁ।

বৃদ্ধের মুখে কিন্তু ফুটে উঠেছে বিস্ময়। বললেন—বলেছে বুঝি?

—কী?

—ওর নাম? বৃদ্ধ বললেন—পুতুল-নামটা ডাকনাম, হুজুরদের খাতায়-পত্রে ওর নাম আছে—ভামিনী। মেয়ে আমার দেখতে শুনতে পুতুলের মতোই ছিল। কী যে ওর ভাগ্য!

বলতে-বলতে ঝরঝর করে কেঁদে ফেললেন বৃদ্ধ; বললেন—সময় হয়ে গেছে বাবা, ওকে এবার নিয়ে আসি।

কিন্তু দু-পা এগিয়ে গিয়ে আবার ফিরে এলেন, বললেন—ভগবান তোমাদের মঙ্গল করুন, তোমরা আমার ছেলের বয়সী, তাই তুমি করেই কথা বললাম, মনে কিছু করো না। সেপাই তো দেখেছি, কিন্তু এমনটি আর দেখিনি।

বলে, আমার দিকে ফিরে বললেন—তোমার নামটি কী বাবা? জানতে পারি?

—প্রমোদ!

—প্রমোদ!—কথাটা উচ্চারণ করে একটু বুঝি ভাবলেন, একটু অবাকও হলেন বুঝি।

ওঁর সমস্যাটা বুঝলাম। এ-ধরনের নামের সঙ্গে উনি খুব বেশী পরিচিত নন। একটু হেসে বললাম—আমার বাবা একটু লেখাপড়া শিখেছিলেন, মাষ্টারী করতেন। শখ করে ছেলের ঐ নাম রেখে গেছেন।

বললেন—খুব ভালো। এবার একটা কথা বলব, বাবা?

—বলুন।

—এলে তো গাড়িতে। সে-গাড়ি চলে গেছে। আমাদের গাঁয়ে একখানা গাড়ি আছে, জুতে দিতে বলব? খরচাটা আমিই দিয়ে দেবো। মেয়েটা কাল থেকে উপবাসী, ওকে তোমরা যেন হাঁটিয়ে নিয়ে যেও না—

বলতে বলতে গলাটা ওঁর ধরে এলো। নিজেকে সামলাবার জন্যই বুঝি তাড়াতাড়ি চলে গেলেন ভিতরে। বৃদ্ধ কথাবার্তা বলছিলেন, যাকে আমরা 'সহুরে ভাষা' বলি, সেই ভাষাতেই। সহরে যাদের ঘনঘন যাতায়াত করতে হয়, বা মিশতে হয়. শহরের লোকেদের সঙ্গে, তারা বাইরের লোকের সঙ্গে ঐ ভাষাই ব্যবহার করে, এ আমার অভিজ্ঞতা থেকেই জানা আছে। তবে ভদ্রলোক তথাকথিত 'সহুরে ভাষা' বললেও, কথায় ঐ অঞ্চলের টান ছিল যথেষ্ট, কিন্তু, লিখে বোঝানোর সময় তো সে টান আনা যাবে না, ওটা কল্পনার ওপরই ছেড়ে দিতে হয়।

তার পরের ঘটনাটা সামান্য। গাড়ি তৈরি হয়ে এসে দাঁড়ালো বড়ো রাস্তায়। সেই রকমই একটা ঘোড়ার গাড়ি। পূর্ব নির্দেশ-মতো আমাদের তুলে দিয়ে মহাবীর এবার ফিরে যাবে গাজোল, আমি যাবো মেয়েটিকে নিয়ে সদর থানায়, সেখান থেকে সম্ভবতঃ সদরের সাব-জেলের দরজা পর্যন্ত। তারপরেই আমার ছুটি, তখন কোথায় থাকবে এই মেয়ে, কোথায় থাকব আমি! যে যার কক্ষ-পথে ঘুরবো, কারুর সঙ্গে কারুর দেখা হবে না, কারুর কথা কারুর হয়ত মনেও পড়বে না, তবু, আজ কেন যেন মনটা ভয়ানক ভারাক্রান্ত হয়ে রইল কী এক অপরিজ্ঞাত বেদনায়।

দৃশ্যটা করুণ হওয়াই স্বাভাবিক। আমি আর মহাবীর গাড়ির কাছে দাঁড়িয়ে রয়েছি, মেয়েটিকে নিয়ে আসছে তার বাপ, পিছনে-পিছনে মেয়েদের আর ছোটদের ভীড়। সেই ভীড় থেকে কান্নার রোলও আসছে ভেসে। যেমনটি এক্ষেত্রে হয়, তেমনটিই ঘটছে, কিন্তু দলটি যখন আমাদের কাছাকাছি এসে গেল, আর আমরা যখন স্পস্ট দেখতে পেলাম মেয়েটিকে, তখন আমাদের দুজনেরও বিস্ময় আর সীমারেখা মানলো না!

স্তব্ধ হয়ে গেল মহাবীর পর্যন্ত। দেখলাম, মেয়েটির হাত একেবারে খালি, সেই লোহাটুকুও আর নেই। কোরা একটা থান কাপড় পরিয়ে মেয়েটিকে আমাদের কাছে ধরে ধরে নিয়ে আসছে তার বাবা।

গাড়িটা চলেছে, ভিতরে বসে আছি শুধু আমি আর মেয়েটি মাথা থেকে ঘোমটা সরে গেছে। চোখদুটি লাল, কেঁদে কেঁদে মুখখানাও ফুলিয়ে ফেলেছে। কিছু জিজ্ঞাসা না করেও অনেক কথা জেনে ফেলেছি। শুধু আমি কেন, মহাবীরও। তাই যাবার সময়, মহাবীর একটা কথা পর্যন্ত বলতে পারেনি। আমাকে 'আসি তাহলে' বলতে গিয়েও, দেখলাম, ওর গলাটা ধরে গেছে।

মেয়েটি বিধবা। স্বামী মারা গেছে গাজোলের বাড়িতে। বাপের সাধ্য-সাধনা আর তদারকির ফলে মেয়ের ছুটি মিলেছে জেলখানা থেকে। কিন্তু যখন মিলল, তখন দেহ-সৎকারটুকু প্রত্যক্ষ করার অবকাশ ত দূরের কথা, শ্রাদ্ধ-শান্তিও গেছে চুকে।

বহুক্ষণ নীরবতার মধ্যে কেটে যাবার পর, এক সময় বললাম —আর তোমার চার মাস, না ?

—হ্যাঁ।

বললাম—চার মাসের আগেই ছাড়া পাবে বোধহয়। কী নিয়মে মেয়াদ যেন কমে যায়, শুনেছি।

কথা বলল না মেয়েটি।

একটু পরে বললাম—নাম যে পুতুল, তা জেনেছি। কোন্ নামটা ভালো লাগে, ভামিনী, না, পুতুল ?

মেয়েটির মুখখানা যেন মুহূর্তে গম্ভীর হয়ে গেল, মুখখানা ফিরিয়ে নিলো সে অন্য দিকে।

এবারে সে বসেছে গাড়োয়ানের পিছনে, আমি তারও পিছনে। কয়েদী যাচ্ছে, না, বৌ যাচ্ছে, তা বাইরে থেকে কারুর বোঝবার উপায় নেই॥

বললাম—তোমরা দেশী, অথচ রাজবংশীর সঙ্গে বিয়ে হলো কী করে ?

উত্তর নেই।

বললাম—ভালো কথা। বঙ্গালপাড়ায় কার বাড়িতে তোমার বিয়ে হয়েছিল বলো তো ?

এবারেও উত্তর নেই।

বললাম—আমি তোমার শ্বশুর-পাড়ার লোক, অথচ তোমাকে চিনতে পারছি না, এ-বড়ো আশ্চর্যের কথা নয় ?

কথা বললে এতক্ষণ পরে। সেইরকম সহুরে ভাষা, তবে আশ্চর্য, আঞ্চলিক টান ওর বাপের থেকেও কম। ধীরকণ্ঠে বললে—থেকেছি কতটুকু শ্বশুরবাড়িতে ?

—কেন ?

—সে অনেক কথা।

একটুক্ষণ থেকে তারপরে বললাম—শুনতে বড়ো ইচ্ছা হয়।

ম্লান একটু হেসে চুপ করে রইল।

বললাম—জিজ্ঞাসা করা কর্তব্য, তাই জিজ্ঞাসা করছি, খেয়েছ কিছু ?

—হুঁ।

—কী ?

—দুধ।

—ব্যস্ ?

চুপ করে রইল। বললাম—বাবা আসতে চাইলেন সঙ্গে আসতে দিলে না কেন?

—জ্বর হয়েছে বাবার।

—তাহলেও যখন আসতে চাইলেন—

বাধা দিয়ে বলে উঠল—না। জেলের দরজা থেকে এক একা ফিরে আসতে ওঁর কস্ট হবে।

—তা বটে।

গাড়ি তখন একটা বাঁক ঘুরে বড় রাস্তায় পড়েছে। বিধবার সিঁথির মতো অ-রঙীন ঋজু পথ।

কিছুক্ষণ চলবার পর আমি আবার বললাম কথা। বললাম—শেষ সময়টা স্বামীর সঙ্গে দেখাও হলো না। কী হয়েছিল?

মুখ নীচু করে কোনক্রমে চোখের জল রোধ করতে লাগল, কিছু বলল না।

বললাম—কতো বয়স হয়েছিল?

—প্রায় পঞ্চাশ।

চমকে উঠলাম, বললাম—বুড়ো বর!

একটু সামলে নিয়ে ম্লান হেসে বললে—বুড়ো দেখাতো না।

—কী হয়েছিল? কী অসুখ?

—অসুখ না।

—তবে?

—গলায় দড়ি।

বলতে বলতে আঁচলটা টেনে নিয়ে চোখের ওপর চেপে ধরলে। আমি দ্বিগুণ বিস্মিত হলাম নিজের ব্যাপার লক্ষ্য করে। সপ্তাহে-সপ্তাহে মা-বোনের কাছে যাই, পাড়ায় এতবড়ো ঘটনা ঘটল, কোনো খোঁজই রাখি না। আচ্ছা, আমিই না হয় রাখি না, মা

কিংবা বোনও তো এসব গল্প আমার কাছে করতে পারত। নাকি, এসব তারাও শোনেনি! আমি সময় পেলে বই আর খাতা নিয়ে ব্যস্ত থাকি বলে কি জীবন সম্বন্ধে কোনো কৌতূহল আমার নেই? আমার মায়ের প্রতিই অভিমান হতে লাগল বেশী।

মেয়েটিকে বললাম—গলায় দড়ি কেন?

বললে—সে অনেক কথা।

—শুনতে বড়ো ইচ্ছা হয়।

মেয়েটি এবার চুপ করে রইল।

বললাম—আচ্ছা, না হয় প্রথম কথাটাই বলো। সদরে এসে গেলাম, এরপর আর জিজ্ঞাসা করার সময় পাবো না।

—কী?

—তোমার কয়েদ হয়েছিল কেন?

ধীর কণ্ঠে এতক্ষণে উত্তর দিলো মেয়েটি—চুরি করেছিলাম।

—কী চুরি?

—সে অনেক কথা।

এবারেও বলতে গিয়েছিলাম, জানতে ইচ্ছা করে। কিন্তু উত্তর পাবো না জেনেই চুপ করে গেলাম। দেখতে শুনতে অতি সাধারণই এক গ্রাম্য মেয়ে, কিন্তু ভিতরে ভিতরে একেবারে অন্য ধরনের মানুষ। অথচ মেয়েদের সঙ্গে মিশেছিই বা কতো আমি? কতটুকু জেনেছি তাদের? আমার জগৎ আমাদের ব্যারাকের মানুষগুলিকে নিয়ে। পদ্য লিখে আজও খাতা ভরিয়ে ফেলি, সে সব শোনাব আর কাকে? শোনাই ঐ ব্যারাকের সহকর্মীদেরই। তারা হাসে, ব্যঙ্গ করে। আলকাপের সুর নকল করে অনেকে গেয়ে ওঠে 'পুলিশ লিখেছে পদ্য ভাবনের আদ্যশ্রাদ্ধ, হায়, হায়, করি কি উপায়!'

ব্যথা পাই, তবু তাদেরই, আবার না শুনিয়ে পারি না।

গ্রামের বাড়িতে যাই সপ্তাহে একদিনের জন্য। সে একদিনে দেখি কতটুকু? মিশতে পারি ক'জনের সঙ্গে? গ্রামের একজন হয়েও গ্রামে আমি বুঝি চির-আগন্তুক।

মেয়ে কয়েদীও যে আগে দু-একটি না দেখেছি এমন নয়। সদর থানায় একবার এক স্বামী খুন-করা মেয়ে দেখেছিলাম। আর একবার হাজতে দেখেছিলাম এক পতিতা মেয়েকে। কিন্তু তাদের সঙ্গে যে এর তুলনা হয় না, এটুকু বুঝবার ক্ষমতা আমি এতদিনে অর্জন করেছি। এমন কি চুরির কথাটা ও নিজে মুখে বলা সত্ত্বেও আমার তা বিশ্বাস করতে ইচ্ছা করছে না। কেন যেন মনে হচ্ছে সব ভুল। সবাই মিলে কী একটা প্রচণ্ড ভুল করে বসে আছে মেয়েটি সম্পর্কে। ওকে যেভাবে দেখা যাচ্ছে, ওকে যেভাবে দেখানো হচ্ছে, ও তা নয়, এ আমার ধ্রুব বিশ্বাস।

নিজের মনেই চিন্তা করে চলেছি, হঠাৎ শুনি নিজে থেকেই এবার কথা কয়ে উঠেছে মেয়েটি। বললে—আচ্ছা, একা কেন আপনি? সে পুলিশটি কোথায় গেল?

—চলে গেছে গাজোল।

বলেই মনে হলো, মেয়েটি তবু আমার সঙ্গে বাক্যালাপ করছে, মহাবীরের সঙ্গে কিন্তু আদৌ করে নি। কথাটা মনে হতেই অদ্ভুত একটা আত্মপ্রসাদ অনুভব করলাম। তারপর কিছু একটা বলা দরকার মনে করে হঠাৎই বলে ফেললাম—আচ্ছা, আমার সঙ্গে এভাবে একা যেতে ভয় করছে না?

প্রথমে একটু অবাক হলো সে, তারপরে ঠোঁটের প্রান্তে রেখায়িত হয়ে উঠল বিচিত্র এক হাসি। সে হাসি মুহূর্তে আমাকে বুঝিয়ে দিলে, প্রশ্নটা কতো অবান্তর!

কথা হলো না আর। দুজনেই বসে আছি চুপচাপ। কাব্য করে বলা যায়, আকাশে ফুটে আছি পাশাপাশি দুটি তারা, অথচ একের সঙ্গে কথা নেই অপরের, শুধু আছে ভাবনার আলো, একের ভাবনা দিয়ে অপরকে ছুঁয়ে যাচ্ছে মাঝে মাঝে।

পরক্ষণেই মনে হলো, এ আমি ভাবছি কি! আমার ভাবনা জাগছে বটে, কিন্তু ও-ও কি ভাবছে আমার কথা, মুহূর্তের জন্য ?

হাসি এলো ঠোঁটের কোণে। সদ্য বিধবা, ওর এখন অন্য কারুর কথা ভাববার অবসর কই ? আর তাছাড়া, আমার মধ্যেই বা এসব এলোমেলো চিন্তা আসছে কী করে ? কী হলো আমার ?

একটা ব্যাপারে মনে-মনে অবাক না হয়ে উপায় নেই, যার ফলে একটু শ্রদ্ধাও জাগে মেয়েটির প্রতি। আমি যখন স্কুলে পড়তাম বই পড়ার নেশা আমার তখন থেকে। এবং সেজন্য অদ্ভুত এক অভ্যাস গড়ে উঠেছিল আমাব মধ্যে। আমি বইয়ের ভাষায়, অর্থাৎ শক্ত-শক্ত বাংলা শব্দ দিয়ে কথা বলার অভ্যাস করতাম। বন্ধুরা খ্যাপাতো, বলতো তুই যে কলকাত্তিয়া হছিস।

বিভিন্ন থানায় ঘুরেছি গত সাত বছর ধরে, সেখানেও সহকর্মীদের মধ্যে আমাকে নিয়ে হাসাহাসির অন্ত ছিল না। রায়গঞ্জ থানায় যখন ছিলাম কিছুদিনের জন্য, তখন এক রাজবংশী সহকর্মীও পেয়েছিলাম। তার ছিল হিন্দী কথা বলার ফ্যাশন। বলতো—হামরাগুলা আসলে বঙ্গাল-এ নই, তুই তা জানিস ? বঙ্গালভাষা কইস ক্যানে ? মোরা হনু ক্ষত্রিয়, রাজপুত্‌নাব মানুষ। পরশুরাম মুনি তাড়েয়া দিলে, তাত্তে মোরা বঙ্গাল দ্যাশে আসনু।

এ ইতিহাস চিন্তায় মনটা যে গৌরব অনুভব করত, সেকথা মিথ্যা নয়। কিন্তু তা বলে, বাংলা ভাষার চর্চাটা যে হঠাৎ ছেড়ে দেবো, এ ভাবতে পারিনি কখনো। আমার কথার মধ্যে

বরেন্দ্র এলাকার টান যথেষ্ট, তবু আজকালকার বইয়ের ভাষাই বলবার চেষ্টা করি ; যা সচরাচর লক্ষ্যে পড়ে না। তাই অবাক হলাম মেয়েটির কথাবার্তার ঢংয়ে সেই ভাব দেখে। ওর কথার মধ্যে এ অঞ্চলের টান আমার থেকেও বেশী, কিন্তু ভাষাভঙ্গী অনেকটা আমার মতো। এ কী দীর্ঘ আট মাস কারাগারে থাকার ফল ? অর্থাৎ, আটমাস ধরে অন্য মেয়েদের সঙ্গে কথা বলাবলি করে কি এই ভাষাভঙ্গি শিখেছে সে ?

কিন্তু এসব জিজ্ঞাসা করি কাকে ? স্থির জানি, কোনো উত্তরই দেবে না মেয়েটি। অথচ, পথ শেষ হয়ে আসছে। ঐ তো সামনে মহানন্দা নদী—এবার নামতে হবে। ঠিক সেতু বলতে যা বোঝায় তা নয়। নদীর ওপর নৌকোর পর নৌকো সাজিয়ে কাঁচা পোল তৈরি করা। গাড়ি যায়, মোটর যায়। তবে, হালকা হয়ে। মানুষজন হেঁটে পার হয়, ওপারে গিয়ে আবার গাড়িতে ওঠে।

আমাদের নামতে দেখে গাড়োয়ান বললে—নামেন না, বসি থাকেন, ঠিক চলি যামো।

—তা হোক, তবু নামি।

হাত ধরে নামালাম মেয়েটিকে। আমার দিকে তাকালো স্থির দৃষ্টিতে, তারপর বললে—কোমরে দড়িটা পরাবেন না ?

হঠাৎ কেমন যেন লজ্জা পেলাম কথাটায়। মুখটা তাড়াতাড়ি অন্যদিকে ফিরিয়ে নিয়ে বললাম—না।

পাশাপাশি চলতে আরম্ভ করল নিশ্চুপে। পুলিসের সঙ্গে মেয়ে দেখলে লোকের চোখ স্বভাবতই পড়ে সেদিকে। যে দু'-একজন সেতু পার হচ্ছিল, তারা মুখ ফিরিয়ে বারবার তাকাচ্ছিল। তবে, মেয়েটি যে কয়েদী, এটা তাদের পক্ষে

বোঝা সহজ না হতেও পারে। পুলিস বলে কি আমি মানুষ নই? আমার সঙ্গে কি চলতে পারে না আমার বাড়ির কোন মেয়ে?

মাঝ নদীতে এসেছি, ঠিক কাছাকাছি কোন লোকজন নেই, মেয়েটি বললে—আমি যদি এবার ছুটে পালাই?

মুখের দিকে তাকালাম মেয়েটির।

একটু যেন হাসি-হাসি মুখ, তবু গভীর এক ব্যথার ছাপ সেখানে মুদ্রিত হয়ে আছে। আবার বললে—আমি যদি নদীতে ঝাঁপিয়ে পড়ে সাঁতরে দূরে চলে যাই?

বললাম—কোথায় যাবে? কোথায় পাবে স্থান? আমাদের রীতিনীতিও জানি, দেশীদের রীতিনীতিও জানি। এতো যে কাণ্ড হয়েছে, এতো যে লেখাপড়া শেখার ব্যবস্থা হয়েছে আমাদের, তবু যেখানে থাকবার সেখানেই রয়ে গেছি।

যে-লঘুতার স্পর্শ জেগেছিল মেয়েটির কণ্ঠে, মুহূর্তে তা পরিবর্তিত হয়ে গেল। গম্ভীর হয়ে গেল মেয়েটি। মুখ নীচু করে যেমন চলছিল, আবার চলতে লাগল আমার পাশাপাশি।

গেলাম ওপারে, গাড়িতে ওঠালাম ওকে আবার হাত ধরে। লোকজন ভীড় করে দেখতে লাগল আমাদের। তাড়া দিলাম ওদের পুলিসী হুঙ্কারে, বললাম—দেখছেন কী? বাড়ীর মেয়ে নিয়েও রাস্তা চলতে পারব না?

সরে গেল লোকজন, গাড়ি ছেড়ে দিলো। বললাম—আমার কাজ তো এবার শেষ। তুমি তো আবার গিয়ে ঢুকবে জেলের মধ্যে। অনেককিছু জানার ছিল, কিছুই জানা হলো না কিন্তু।

মেয়েটির বিষণ্ণ মুখে বুঝি ফুটে উঠল আরও বিষণ্ণ হাসি, বললে কী আর জানবার আছে? চুরি করেছি, কয়েদ * হয়েছে। স্বামী মনের দুঃখে গলায় দড়ি দিয়েছে। ছাড়া পাবার পর,

শ্বশুরবাড়ি—বাপের বাড়ি, দু' বাড়িই যে বন্ধ হয়ে যাবে, এটা যখন বুঝেছেন, তখন সবই বুঝে গেছেন আমার সম্বন্ধে। নতুন করে কী বলার আর থাকতে পারে আপনাকে ?

কথাগুলো সে একসঙ্গে বলেনি, থেমে-থেমে, ইতস্ততঃ করে, তারপরে বলেছে।

সদর থানার কিছুটা আগে গাড়িটা দাঁড় করালাম। নামলাম আমরা দু'জনে। গাড়োয়ানকে ভাড়ার টাকা দিতে গেছি, সে নিলো না, বললে—পুতুলের বাপ দিয়্যা দিছে।

গাড়ির মুখ ফিরিয়ে চলে গেল প্রৌঢ় গাড়োয়ান, তার দিকে বহুক্ষণ দৃষ্টি নিবদ্ধ রেখে চুপচাপ দাঁড়িয়ে রইল মেয়েটি। তাকে যে যেতে হবে, সময় যে বিন্দুমাত্র নস্ট করা চলবে না, এ যেন মুহূর্তের মধ্যে ভুলে বসে রইল সে।

চমক ভাঙল তার অনেকক্ষণ পরে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে—হানিফচাচা আমার কত চেনা, ছোট থেকে দেখেছি ওকে, কিন্তু আমার সঙ্গে একটি কথাও বললো না, আমার দিকে ফিরে চাইল না পর্যন্ত।

—হানিফ-চাচা কে ?

—ঐ যে গাড়ি নিয়ে চলে গেল।

—ও।

হঠাৎ সে তাড়া দিয়ে বললে—নিন চলুন। কোমরে দড়িটা পরান।

আমি বললাম—না-না, এমনিই চল।

মেয়েটি তবু দাঁড়িয়ে রইল। ভঙ্গিতে তার কৌতুকের লেশমাত্র নেই, গম্ভীর কণ্ঠেই বললে—নইলে, আপনিই ধমক খাবেন দারোগার কাছে। পরান দড়ি।

—না। ধমক খাই খাবো, তুমি চলো দেখি এবার।

বিনা বাক্যব্যয়ে হাঁটতে লাগলাম দু'জনে—পাশাপাশি। ঐ তো সদর থানা। ওখানে পৌঁছানো মাত্রই তো সব শেষ হয়ে যাবে, তখন কোথায় যাবে মেয়েটি, আর কোথায় আমি। দিন যাবে, দু'জনের কথা দু'জনে ভুলে যাবো। ও তো ভুলে যাবেই, হয়ত আমিও ভুলে যাব।

কী হল হঠাৎ, যে-কথা বলবো না ভেবেছিলাম, সে কথাই বেরিয়ে গেল মুখ দিয়ে, বলে ফেললাম—আর দেখা হবে না।

চকিতে মুখ ফিরিয়ে আমার দিকে তাকাল মেয়েটি, তৎক্ষণাৎই কিছু বললো না, বললো অনেক পরে, থানার কাছাকাছি এসে ঝাঁকড়া গাছটার নীচে, ছায়ায় দাঁড়িয়ে। বলল—পুলিস যে এমন হয় জানা ছিল না। বাড়িতে কে-কে আছেন?

—মা আর ছোট বোন।

মুখ নীচু করেই চাপা কণ্ঠে প্রশ্ন করল—বিয়ে করেন নি?

—না। তবে—

বলে, একটু থেমে, গলাটা একটু পরিষ্কার করে নিয়ে বললাম—জানো তো আমাদের সমাজের রীতিনীতি? বিয়ে করবার জন্য মেয়ে কিনতে হয়, অর্থাৎ মেয়ের বাপকে অনেক টাকা দিতে হয়। মা টাকা দিয়ে রেখেছে একজনকে, মেয়েটি এখনো তেমন বড়ো-সড়ো হয়নি, হলে পরে—

থেমে গেলাম। মেয়েটি বললে—আমাদেরও তাই শুধু আমার বেলায়—

সাগ্রহে বললাম—বলো।

ম্লান হাসলো মেয়েটি, বললে—সে অনেক কথা।

বললাম—বলবার কিন্তু অনেক সময় পেয়েছিলে।

—পেয়েছিলাম সত্যি, মেয়েটি বললে—কিন্তু বলে কী হবে? বকবক করতে ভালো লাগে না। জেলে থাকতে থাকতে কথা না বলা অভ্যাস হয়ে গেছে।

বলে উঠলাম—আচ্ছা! এমন ভাল বাংলা কথা বলতে শিখলে কোথা থেকে?

চোখ তুলে তাকালো, বললে—বলি নাকি?

—বলোই তো।

—তা হবে।

—কী করে হলো?

তেমনি ম্লান হাসলো, বললো সেই অভ্যস্ত বাক্য—সে অনেক কথা। কিন্তু না শোনাই ভাল।

—কেন?

একটুক্ষণ থেমে থেকে হঠাৎ হেসে ফেলল মেয়েটি, বললে··· পুলিসের স্বভাবই এই, সব-কিছু জানতে চায়। দেখলাম তো অনেক। তারপরেই আমার চোখের দিকে চোখ তুলে তাকালো, বললে না-না আপনি ঠিক সে-রকম নন। আপনি ওদের মতো চড়টা চাপড়টা মারেন না।

ঈষৎ উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠলাম—কে মেরেছে তোমাকে চড়চাপড়?

—বারে চোরকে মারবে না কেন? কথায় বলে, চোরের মার।

একটু থামলো, তারপরে আবার বলে উঠল ঈষৎ চাপা গলায় —তাদের মার তবু সহ্য হয়। সহ্য হয় না আপনাদের মার, যারা মিষ্টি মধুর কথায় মনের কথা টেনে বার করতে চান।

গলাটা শেষের দিকে ধরে এলো পুতুলের। কিন্তু পরক্ষণেই

সামলে নিলো নিজেকে। মাথায় ঘোমটাটা ভালো করে টেনে দিলে, তারপরে বললে—চলুন।

থানায় তখন ভীড়। পিছনের বারান্দার একপাশে ওকে বসিয়ে রাখবার পর কেটে গেল ছুটি ঘণ্টা, সূর্য তখন একেবারে মাথার ওপরে। হিসাব মতো বর্ষাকাল, কিন্তু জলভরা মেঘের আভাষটুকুও নেই আকাশের কোন কোণে।

সদর থানার বড়বাবু মুখার্জীসাহেব আমার পরিচিত, আমি যখন এখানে ছিলাম, সেই তখন থেকে আছেন ইনি। এতক্ষণ পরে আমার ডাক পড়ল তাঁর ঘরে। আমার কাজ মেজবাবু, সেজবাবু থাকলেও চলে যেতো, কিন্তু কী সব তদন্তে তাঁরা বেরিয়ে গেছেন ত্থ'জনেই। আমি সেলাম করে কাছে দাঁড়াতেই বললেন—কী হে সরকার, আছো কেমন ?

—ভালোই স্যার।

—তা' আনো তোমার কাগজপত্র। দেখি। তোমার কাজটা করেই না হয় খেতে-টেতে যাই।

তাড়াতাড়ি ব্যাগ থেকে কাগজপত্র বার করে দিলাম ওঁর সামনে। উল্টে-পাল্টে দেখে নিয়ে বললেন—কয়েদী এনেছ ? মেয়ে কয়েদী! আনো তো দেখি। এই দরওয়াজা!

আমি বলে উঠলাম—স্যার!

—কী ?

—মেয়েটি লক-আপে নেই।

আশ্চর্য হয়ে বলে উঠলেন—তবে ?

—বারান্দায় বসিয়ে রেখেছি। হুজুরের হুকুম না হলে—

বাধা দিয়ে বলে উঠলেন একটু বিরক্ত কণ্ঠে—এই জন্যই তোমার কিছু হলো না সরকার। কয়েদী এনে আগেই লক-আপে

রাখার নিয়ম। নাও, নিয়ে এস মেয়েটাকে। বদনখানি একটু দেখি।

. একটুক্ষণ মাত্র। তারপরেই নতমুখী পুতুলকে নিয়ে এসে ঢুকলাম ওঁর ঘরে। যেমন ধারালো কণ্ঠে সব জিজ্ঞাসাবাদ করতে হয়, তেমনিভাবে সব জিজ্ঞাসাবাদ করে শুনতে শুনতে হঠাৎ যেন চমকে উঠলেন মুখার্জী সাহেব, বললেন—কী সর্বনাশ! তোমারই নাম ভামিনী? গাজোল থেকে আসছ?

বলেই আমার দিকে ফিরে—ওহে তোমার এখন কী কাজ? কোথায় যাবে?

বললাম—গাজোলেই ফিরে যাবো।

সাহেব বলে উঠলেন—তাহলে আরও একটু কষ্ট কর। একেও গাজোলে নিয়ে যাও তোমার সঙ্গে।

কাগজপত্রে কী সব সই-টই করে আমারই হাতে আবার দিলেন ফিরিয়ে, বললেন—নাও ব্যাগে রাখো, সাবধানে। হারিয়ে-টারিয়ে ফেলো না যেন। তোমার আবার যে ভুলো মন। পদ্য-টদ্য লেখার অভ্যেস এখনো আছে নাকি?

একটু লজ্জিত হয়েই বললাম—স্যারের সব মনে আছে দেখছি।

স্থূলকায় মানুষটি হো হো করে হেসে উঠলেন, বললেন—মনে আবার নেই! আমার বড়ছেলের সেদিন বিয়ে দিয়ে আনলুম জানো তো। ভালো বিয়ে দিয়েছি। কলকাতায়। তা বউটি আবার পদ্য লেখে। একদিন হাতে পড়েও গেল, দেখি বেশ লিখেছে, মেঘ-টেঘ করে বৃষ্টি এলো, ময়ূর নাচবে, এইসব। শুনে বললাম—বাঃ বাঃ! আমার থানায় এক কনস্টেবল ছিল, সে-ও পদ্য লিখত শুনেছি। বুঝলে হে সরকার? সঙ্গে সঙ্গে তোমার কথা মনে পড়ে গেল। তা তুমি এবার ইয়ুসুফকে দিয়ে একটা

দরখাস্ত পাঠাও, দেখি সুপারিশ-টুপারিশ করে তোমার কিছু করে দিতে পারি কিনা। কাজ তো মোটামুটি সবই জানো, এল-সি, টেল-সি হতে পারলে তোমার ভালোই হবে, কী বলো?

এ আশ্বাস আজ সাত বছর ধরে বহুবার পেয়ে আসছি। তাই এতে এখন আর উৎসাহিত বোধ করি না। তবু চুপ করে থাকা ভালো দেখায় না, তাই বলে উঠলাম—আপনার দয়া স্যার।

—ঠিক আছে।—সাহেব বললেন—মেয়েটিকে নিয়ে যাও। ওকেও আমরা কাল পাঠিয়েছি, আর সকালে এলো জেল-সুপারের অর্ডার এস-পির সই শুদ্ধ। এত নম্বর কয়েদী ভামিনী দাসীকে বালুরঘাট সাব-জেলে স্থানান্তরিত করা হইয়াছে। যেহেতু উক্ত ভামিনী দাসীকে সদর থানার জিম্মায় ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে এবং যেহেতু সদর থানা গাজোল থানায় তাহাকে নিজ দায়িত্বে পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়াছে, সেই হেতু, গাজোল থানা বালুরঘাটের নিকটবর্তী বিধায়, গাজোল থানা যেন এবারও নিজ দায়িত্বে বালুরঘাট সাব-জেলে উক্ত ভামিনী দাসীকে যথাসত্বর স্থানান্তরিত করিয়া দেয়।" বুঝলে সরকার?

আমাদের শিক্ষা এস্থলে চুপ করে থাকা। কোনো কিছু প্রশ্ন করা নয়। কৌতূহল কিছুটা নিবারিত হলো। হলো অবশ্য সাহেবেরই কথায়। বললেন—সকালে এক কনস্টেবল পাঠিয়ে দিয়েছি গাজোল—সব কাগজপত্র দিয়ে। তুমি বেরিয়ে পড়বার পরে গিয়ে হয়ত সে পৌছে থাকবে। এখনো অবশ্য ফিরে আসেনি। আমার অবশ্য কেস্‌টা সব মনে আছে। চুরির কেস। আট মাস কেটেছে, আরো চার মাস। কনডাক্ট—ভালো। দিন দশেক কয়েদ ইতিমধ্যেই মকুব হয়েছে। বাকী চার মাস ভালোভাবে থাকলে আরও পাঁচদিন পাবে। আর কী। নাও

রওনা হয়ে যাও। দাঁড়াও সরকার, কিছু টাকা নিয়ে যাও। জেল-ডিপার্টমেন্টের কাজকর্ম আজকাল ভালো হচ্ছে, পেমেণ্ট পেতে দেরি হয় না। মেয়েটিকে হোটেলে-টোটেলে কিছু খাইয়ে নিও।

বলতে বলতে এইবার ফিরলেন মেয়েটির দিকে, বললেন··· লক্ষ্মী হয়ে যেও। পালাবার চেষ্টা করো না, বুঝলে?

গাজোলের খাঁ সাহেবও ওকে একথা বলেছিলেন। মেয়েটি ঘাড় নেড়ে তার সম্মতি জানালো।

মুখার্জী সাহেব বললে—ঘাড় ত খুব নাড়ছ। ছাড়া পাবার পর ভালো হয়ে থাকবার চেষ্টা করো। চুরি-টুরি কোরো না। তুমি কী জাত যেন?

—দেশী।

মুখার্জী বললেন—তোমাদের মধ্যে নিকে-প্রথা আছে। বেরিয়ে এসে বিয়ে থা করে সংসারী হয়ো। ব্যস্, আর কী?

মুখ নীচু করল পুতুল, অপাঙ্গে একটু তাকিয়ে দেখলাম, অতি কষ্টে চোখের জল রোধ করবার চেষ্টা করা সত্ত্বেও সে সফলকাম হল না, দুফোঁটা গড়িয়ে পড়ল তার গালের ওপর।

—কাঁদছ কেন? কাঁদবার মতো কিছু তো বলিনি? কয়েদী বলে কেউ বিয়ে করতে চাইবে না? খুব চাইবে। দিনকাল বদলে যাচ্ছে, দেখছ না? নাও হে সরকার, এবার বেরিয়ে পড়ো।

সেলাম করে চলে আসবার সঙ্গে সঙ্গেই পিছন থেকে ডেকে উঠলেন সাহেব। তারপরে একটা সিগারেট ধরিয়ে ধূমোদগীরণ করে বলে উঠলেন—কি হে, জেল থেকে বদলি কেন করল, শুনে গেলে না?—জেলে আর মেয়ে-কয়েদী নেই, আর যে দু'-তিনটি ছিল, ছাড়া পেয়ে গেছে। মেয়েটি একা-একা পড়ে থাকবে

ফিমেল-ওয়ার্ডে, তাই জেল-সুপার পাঠিয়ে দিচ্ছে বালুরঘাট, ওখানে মেয়ে-কয়েদী আছে। দেখেছ, ওরা কী কন্‌সিডারেট? নাও, এসো, এবার আমি উঠব।

রওনা হতে গিয়েও থমকে দাঁড়ালাম। কী জানি, ইয়ুসুফ-সাহেবের মতো ইনিও যদি থমকে ওঠেন। তাড়াতাড়ি দড়িটা বার করে পুতুলের কোমরে জড়িয়ে দিলাম। একটু অবাক হয়েই বুঝি আমার দিকে মুহূর্তের জন্য তাকালো সে, ঠোঁটটা একবার বুঝি কেঁপেও উঠল তার। কিন্তু ঐ পর্যন্ত, তারপরেই ধীর পদক্ষেপে আমাকে অনুসরণ করে বেরিয়ে এলো সে থানা থেকে।

সেই ঝাঁকড়ামাথা গাছটা, যার ছায়ায় দাঁড়িয়ে আমরা কথা কয়েছিলাম, সেইখানে এসে থামলাম আমরা। চারিদিক একবার দেখে নিয়ে খুলে দিলাম ওর কোমরের দড়িটা। তারপরে আবার শুরু করলাম চলতে। আমি সামনে, ও পিছনে। যেতে যেতে, একজায়গায় এসে, একটা ছোট্ট মাঠের মত আছে, সেটা পার হয়ে যেতে পারলে পথ সংক্ষেপ করা যায়। ওকে নিয়ে নির্জন মাঠের মধ্যে পড়ে পায়ে-চলা-পথটা ধরে কিছুদূর এগিয়ে গিয়ে থমকে দাঁড়ালাম, তারপরে চলতে লাগলাম পাশাপাশি। বললাম—কিছু জিজ্ঞাসা করছ না যে?

—কেন?

—কেন নয়? এটা কী হলো? এ কী ভাবতে পেরেছিলে?

হাসল। সেই আগের মতোই বিষণ্ণ হাসি। বললে—কিছু ভাবতে পারার মতো শক্তি আর আমার নেই।

—কেন?

থমকে দাঁড়িয়ে পড়ল, বললে—সত্যি বলব?

—বলো।

বললে—আর পারছি না। মাথাটা ঘুরছে। মনে হয়, কোথাও বসে পড়ি।

বললাম—না, আর একটুখানি চলো। জানা একটা হোটেল আছে। সেখানে যাহোক কিছু মুখে দিয়ে নেবো। তুমিও কিছু খেয়ে নেবে।

—আমি খাবো? মেয়েটির মুখে ফুটে উঠল বিচিত্র হাসি, বললে—বাপের বাড়িতে এক গেলাস শরবত করে দিয়েছিল বড়দি, তাই শুধু পেটে গেছে। আজই হাতের নোয়া খুলেছে আমার, আমার কি আজ কিছু খেতে আছে!

বললাম—তা বলে কষ্ট করবে? খিদে পায় না তোমার?

পুতুল বললে—মেয়েদের খিদের কথা মুখ ফুটে বলতে নেই। নিন্দে হয় সমাজে।

বললাম—সমাজ কোথায় তোমার?

একটু থেমে তারপবে বললে—তা বটে। চলুন।

আর কিছু বলল না সে, আর কিছু আপত্তি করল না। একটা হোটেলে বসে আমি খেলাম, ওকেও খাওয়ালাম। ও শুধু বললে—মাছটা আর খাবো না।

খাওয়া-দাওয়ার পর হোটেল পেরিয়ে আবার পথে এসেছি, ও বললে—দড়ি দিয়ে বাঁধলে পারতেন।

—কেন?

—যা ভাবিনি, তাই করতে ইচ্ছে করছে। ছুটে পালাতে ইচ্ছে করছে। সত্যি বলছি, এবার ঠিক আপনার চোখে ধুলো দিয়ে পালিয়ে যাবো।

—কোথায়?

—খুব একটা বড়ো জায়গায়। যেখানে অনেক লোক। কেউ কাউকে চেনে না, চেনবার চেষ্টাও করে না।

বললাম—সেখানেই যে তোমার স্থান হবে, এটা তুমি ভাবলে কী করে!

আমার দিকে কয়েক মুহূর্ত নির্বোধ-দৃষ্টিতে তাকিয়ে থেকে নীচু করল মুখ, কিছু বললো না।

পান কিনে হাতে দিলাম। হাত সরিয়ে দিলো না, নিলো। গাড়ি একখানা জোগাড় করলাম। হাত ধরে তুলেও দিলাম গাড়িতে। চলতে লাগল গাড়ি। আবার মহানন্দা পেরিয়ে যাওয়া। আবার সেই নির্জন ওপারের পথ। যেতে যেতে নীরবতা ভঙ্গ করলাম আমিই প্রথম।

বললাম—তোমার লোকজন ইচ্ছা করলে ডাকাতি করে নিয়ে যেতে পারে তোমাকে। আমি একা, আর এই নির্জন রাস্তা। দুটি-একটি লোক হেঁটে গাঁয়ের দিকে যাচ্ছে, দুটি-একটি মটোর কি বাস্ হুশ করে এক-একসময় বেরিয়ে যাচ্ছে পাশ দিয়ে। কী সহজ এখন তোমাকে ছিনিয়ে নেওয়া!

বললে—লোকজন আমার কই? আর দরকারই বা কী লোকজনের! ইচ্ছা করলে আমি একাই পালাতে পারি। সাধ্য কি আমাকে ধরেন!

বললাম—সাধ্য থাকার তো দরকার নেই। পালিয়ে যাবে কোথায়? পুলিশ আবার তোমাকে খুঁজে বার করবে, আরও কয়েদ বেড়ে যাবে তোমার।

—ক্ষতি কি! আমার জেলেও যা, বাইরেও তাই।

বললাম—তবে তো বুঝেছই, পালানো, না-পালানো, তোমার পক্ষে একই।

বললে—তাই তো চুপ করে আছি।

আরও কিছুক্ষণ কেটে গেল। বললাম—বেরিয়ে কোথায় যাবে? শ্বশুরবাড়ি?

—না। তারা নেবে না।

—তবে? বাপের বাড়ি?

—না। তারাও নেবে না। মা বলে দিয়েছে।

—মা!

—সৎমা।

বললাম—বাবা কী বললে?

—কী বলবে! সমাজের অত্যাচার শুরু হয়ে গেছে। ছোট বোনটার বিয়ে দিতে হবে না? আমি থাকলে, বিয়ে দেওয়া মুস্‌কিল।

বললাম—তোমাদেরও তো আমাদের মতো মেয়ের বাপকে যৌতুক দিতে হয়?

—তা হয়।

—তবে?

বললে—যৌতুক এক কথা, আর সমাজের বিচার অন্য কথা। বোনের বিয়ের সব ঠিক হয়ে আছে, সেটা না ভেঙে যায়। আমি ওখানে কিছুতেই যাবো না।

একটুক্ষণ থেমে থেকে তারপর বললাম—তাহলে, দারোগা-সাহেব যা বললেন, তাই তোমার করা উচিত। নিকে-প্রথা যখন তোমাদেরও আছে, তখন বিয়ে করে সংসারী হওয়াই যুক্তিযুক্ত।

চট্ করে মুখ ফিরালো, ঘোমটাটা টেনে আড়াল করার চেষ্টা করল মুখ, কিন্তু তবু লুকানো গেল না, ঝরঝর করে কেঁদে ফেলল সে।

একটু বিস্মিত হয়েই এবার ওকে বললাম—আচ্ছা, এত শক্ত মেয়ে তুমি, বিয়ের কথা উঠলেই কাঁদো কেন?

উত্তর দিল না, আস্তে আস্তে সামলে নিলো নিজেকে। এবং তারপর সেই যে নীরব হয়ে গেল, আর ওকে কথা বলায় কে? মহাবীরের ভাষায়, "ওর মুখে যেন কে কুলুপ এঁটে দিয়েছে।"

মহাবীরের কথা স্মরণ হতেই হঠাৎ একটা চিন্তার আভাষে উদ্বেলিত হয়ে উঠল আমার মন। পুতুলকে বললাম—যদি বলো তো আমি পাত্র দেখে দিতে পারি।

কোনো উত্তর নেই। বললাম—পাত্র তুমি দেখেছ। সেই যে লোকটা, তোমায় সদর থেকে গাজোলে দিয়ে এসেছিল, সে। মহাবীর তার নাম। কেউ কোথাও নেই, একেবারে একা। পশ্চিমা, কিন্তু ছোট থেকে এ অঞ্চলে থাকতে থাকতে এদিক-কারই মানুষ হয়ে গেছে। জাতে ক্ষত্রিয়, বিয়েতে কোনো অসুবিধা নেই।

কিন্তু কাকে বলছি এসব কথা? নির্বাক, নিশ্চল প্রস্তরখণ্ডের মতো ঘোমটা টেনে সে বসে আছে বাইরের পথের দিকে মুখ ফিরিয়ে। না আছে সাড়া, না আছে কিছু, যেন প্রাণ-স্পন্দনটুকুও স্তব্ধ হয়ে গেছে।

মহাবীরের কথা জানি। আমার থেকে বয়সে অনেক বড়ো, প্রায় চল্লিশ হলো বয়স। আজকাল যাকে বলে 'বিয়ে-পাগলা', ও হয়ে গেছে তাই। ওর পক্ষে আবার মেয়ে পাওয়াও শক্ত। পশ্চিমে গিয়ে যে পাত্রী সংগ্রহ করবে, তাতেও যেন কী সামাজিক বাধা-নিষেধ আছে, সঠিক জানি না। কিন্তু এর কাছ থেকে সাড়া না পেলে মহাবীরের কাছে প্রস্তাবটাই বা করি কী করে?

নীরব-নিথর-নিস্তব্ধ এক প্রতিমাকে নিয়ে যখন গাজোল থানার

দরজায় গিয়ে পৌঁছলাম, তখন অপরাহ্ন হয়ে এসেছে, বড়সাহেব তখনো দপ্তরে আসেন নি।

আসতে-আসতে হয়ে গেল প্রায় সন্ধ্যা, মেয়েটিকে যথারীতি লক-আপে নিয়ে গিয়ে রাখা হয়েছে। আমার সামনে থেকে যখন ওকে ইয়াসিন নিয়ে গেল, একটি বারও মুখ তুলে তাকালো না সে, একটি কথাও আর বলল না। হাজতের বড়ো তালাটায় চাবি দিল ইয়াসিন, দিয়ে তালাটা টান দিয়ে দেখতে গিয়ে ঘটাং করে একটা শব্দ হলো। একটা প্রবল 'না' যেন ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠলো চারিদিকে। কে যেন আর্তকণ্ঠে বলে উঠল—না।

না। জানতে চেয়ো না। জানতে চেয়ো না আমার কিছু।

কত কী ঘটে গেল তারপর। খাঁ সাহেব এলেন, কথা হলো, কাগজপত্রগুলি তাঁর হাতে এগিয়ে দিলাম। সব ব্যাপার বুঝে নিয়ে তিনি বললেন—ঠিক আছে। আজ থাক। কাল সকালে যা হয় ব্যবস্থা করা যাবে। এখন তোমার ছুটি।

গেলাম ব্যারাকে। কে-কে কতো-কী কথা জিজ্ঞাসা করল, মহাবীর কতো-কী রসিকতা করল, কিছুই যেন আমাকে স্পর্শ করছে না। রাত্রে বিছানায় শুয়েও আনমনে ভেবে চলেছি তার কথা। অতি সাধারণ চেহারার একটি মেয়ে, বয়স কম হলেও চেহারার যে এক দুর্নিবার আকর্ষণ আছে, এমন নয়। অথচ, কী যে তার আছে জানি না, আমাকে যেন চুম্বকের মতো আকর্ষণ করছে তার কথা। আমি কি তবে মোহগ্রস্ত? আমি কি তবে তার রূপমুগ্ধ?

চাবুক খেয়ে যেন মুহূর্তে সজাগ হলো মন। ছি-ছি! আমি না বাগ্‌দত্ত? আমার মুখের দিকে তাকিয়ে না বসে আছে আমার মা আর বোন? আমি যদি এই কয়েদী মেয়েটিকে নিয়ে

ঘরে তুলি, তো, স্থির জানি, মা কেঁদে-কেটে অনর্থ করবে। শুধু তাই নয়, বোনের বিয়ে নিয়ে দেখা দেবে বিপুল সমস্যা। বোনের বিয়েরও তো সব ঠিকঠাক হয়ে আছে, যৌতুক দিয়ে গেছে সেই বঙ্গালবাড়ি থেকে আমাদেরই স্ব-ঘরের একটি লোক। উপাধি তাদের সিংহ। আমরা যেমন 'সরকার' উপাধি গ্রহণ করেছি, ওরাও তেমনি নিয়েছে—সিংহ। রায়গঞ্জের কাছে হচ্ছে বঙ্গাল-বাড়ি, রায়গঞ্জ থেকে পাঁচ মাইল দূরে, কালিয়াগঞ্জের দিকে আসতে। ছেলেটার নাম—রাজেন। বেশ ছেলেটা, রায়গঞ্জের করোনেশন স্কুলে উঁচু ক্লাসে পড়ছে। এ ছেলে হাতছাড়া হলে ভয়ানক দুঃখের ব্যাপার হবে। তাছাড়া, আমাদের পাড়ার সেই মেয়েটি তো আছেই। রাধা তার নাম, ডাকে সবাই রাধি বলে। রাধির বয়স কম, বিয়ের যোগ্য এখনো হয়নি, তবু 'বর'-এর কথা উঠলে লজ্জা পায়। আমাদের পাশের বাড়িরই মেয়ে। কাছে আসে না, আমাকে দেখলেই ফিক্ করে হেসে ছুটে পালায়। আর বছরখানেক গেলেই সে আমাদের ঘরে আসবে, বলে সবাই অনুমান করছে।

রাধিই তো আমার হবে, কিন্তু মাঝখান থেকে এ আবার কে হঠাৎ আমার সামনে এসে দাড়ালো? ছটফট করতে লাগলাম শুয়ে। কিন্তু না, জোর করে মনটাকে ফিরিয়ে আনতে হবে। যেমন করে হোক, মহাবীরের সঙ্গে ওর বিয়েটা দিয়ে দিতে পারলেই আমি হবো নিশ্চিন্ত। মনকে বলতে পারবো, ওর জন্য তবু তো একটা কিছু করতে পারলাম। কিন্তু কিছু একটা করতে চায়-ই বা কেন মন? বিচিত্র মানুষ, আর বিচিত্র তার অন্তর! যে কেউ তোমাকে আন্তরিকতার সঙ্গে কিছু দিক, দিক তোমাকে একটি মুহূর্তেরও সঙ্গ, তোমার অন্তর তার প্রতিদান দেবার জন্য

অমনি উৎসুক হয়ে উঠবে। এ-ও এক আনন্দ। আনন্দ দিয়ে আনন্দের ঋণশোধ।

ঘুমিয়ে পড়েছিলাম কখন জানি না, হঠাৎ একটা স্বপ্ন দেখতে দেখতে ঘুম ভেঙে গেল। তাকিয়ে দেখি, সবাই বিছানা ছেড়ে উঠে গেছে, বেশ বেলা হয়ে গেছে। চট্ করে উঠেই পড়া উচিত, কিন্তু আজ ইন্‌স্‌পেক্‌শন নেই জানি, তাই আলস্যভরে বিছানায় শুয়ে-শুয়ে সেই অদ্ভুত স্বপ্নটির কথাই ভেবে চললাম কিছুক্ষণ। দেখেছিলাম, যে-যেখানে আছে, সবারই হাতে শিকল বাঁধা রয়েছে, সবাই যেন কয়েদী। রাধা কয়েদী, পুতুল কয়েদী, খাঁ সাহেব কয়েদী, মহাবীর কয়েদী, মুখুজ্যে সাহেব কয়েদী, সবাই হাত-বাঁধা অবস্থায় মাঠের ওপর সার বেঁধে দাঁড়িয়ে আছে। দাঁড়িয়ে আছি আমিও, রাধা ও পুতুলের ঠিক মাঝখানে। আর, আমাদের সামনে আর্মড্ পুলিসের দল দাঁড়িয়ে আছে বন্দুক নিয়ে। কী-এক ভয়ঙ্কর অপরাধে আমরা অপরাধী, ওরা আমাদের গুলি করে মারবে। কিন্তু, হঠাৎ লক্ষ্য পড়ল, ওদেরও হাত বাঁধা। বাঁধা-হাতে গুলি করবে কী করে ওরা? ওদেরও গুলি করা হচ্ছে না, আমরাও মরছি না। অথচ, দাঁড়িয়ে আছি। দাঁড়িয়ে আছি যেন অনন্তকাল ধরে। মুখোমুখি দু'সার বন্দী, শুধু বাঁধা হাতে কাতর ক্রন্দনে ভেঙে পড়ছি—ওগো, মুক্তি দাও, মুক্তি দাও!

বোধহয় অব্যক্ত এক ক্রন্দনের আবেগ নিয়েই নিদ্রাভঙ্গ হয়েছিল। স্বপ্নের কথাটা চিন্তা করতে করতে মনে হলো, এই নিয়ে একটা কবিতা লিখলে কেমন হয়! আমি বলি কবিতা, ওরা বলে—পদ্য। তা বলুক, কিন্তু কী অদ্ভুত স্বপ্নই না দেখলাম আমি! বন্দী তো আমরা সবাই। রাধা বন্দী তার জীবনের সম্ভাবনার স্বপ্ন নিয়ে, পুতুল বন্দী তার ইতিহাস নিয়ে, আমি বন্দী

আমার খণ্ডিত, স্তব্ধ, স্রোতহীন কর্মজীবন নিয়ে। হঠাৎ যদি আমরা মুক্তি পেয়ে যাই তো কেমন হয়? রাধা যে-জীবনের সঙ্গে নিজের জীবন বেঁধে স্বপ্ন দেখছিল বিপুল এক সম্ভাবনার, সে সম্ভাবনাই ঘটল অন্য এক জীবনের সঙ্গে নিজেকে জড়িয়ে দিয়ে। পুতুল মুক্তি পেলো তার নিষ্ঠুর ইতিহাস থেকে। আর আমি হলাম বেগবান আমার কর্মের ব্যাপ্তি নিয়ে, পরিণতি নিয়ে, আনন্দ নিয়ে।

কিন্তু তা' কি হবার? অথচ, এ কী অদ্ভুত স্বপ্ন-সঞ্চার হলো আমার মনে, যা থেকে নিজেকে ছাড়িয়ে নেওয়া ছিনিয়ে নেওয়া, ক্রমশ অসম্ভব হয়ে উঠছে? উঠে, স্নানাদি সেরে, অফিস-ঘরের দিকে যাচ্ছি, তখনো সেই সঞ্চারিত স্বপ্ন আমার মনে ক্রমাগত চলেছে ঢেউ তুলে। আকাশটাও মেঘলা, তরু শিরে শিরে বাতাস এসে হিল্লোল তুলে যাচ্ছে, কোথায় কী পাখী যেন ডেকে ডেকে উড়ে যাচ্ছে বন থেকে বনান্তরে। এখুনি তো দেখা হবে। আবার তো শুরু হবে সেই পথচলা, গাজোল থেকে বুনিয়াদপুরের মোড় হয়ে,—বালুরঘাট। পথে যেতে যেতে এবার বলব—কী মনে করেছ তুমি আমাকে? এই খাকীর পোশাকটাই কি আমার সব? চাও তো, এ পোশাক এখনি টান মেরে ফেলে দিতে পারি। জমি-জমা যা আছে, মা-বোনের অভাব হবে না তাতে। আমি বেরিয়ে পড়ব রাধিকে নিয়ে অন্য জগতে, কিন্তু তার আগে করে দিয়ে যাবো তোমার সংসার। ঐ মহাবীরকে নিয়েই ঘর বাঁধো তুমি। আমার কথা কী জানো? আমি বিদ্রোহের অবকাশ পেলাম না। স্কুলে ভালো ছাত্র ছিলাম, কাকার ছেলেরা ক্লাসে শুধুই ফেল করত। পাস করে বেরুলাম, পাছে মালদহে গিয়ে কলেজে ভর্তি হই, তাই মাকে বুঝিয়ে সুঝিয়ে একপ্রকার জোর করেই আমাকে চাকরিতে

ঢুকিয়ে দিলে কাকা! আমি সেই থেকে বিমূঢ়ের মতো সাত-সাতটি বছর পথ হেঁটে চলেছি। আমি যে ঘুমিয়ে আছি এই সাত-সাতটা বছর, এ আমাকে মনে করিয়ে দেবার কেউ ছিল না। তুমিই হঠাৎ আমাকে বললে—কী রকম পুলিস আপনি, চড়-চাপড়ও দিতে জানেন না!

কিন্তু তার থেকেও কঠোর কথা বলেছ। বলেছ—তার থেকেও নিষ্ঠুর আপনারা, মিষ্টি মধুর কথা বলে অন্তরের কথা বার করে নিতে চান! আপনাদের প্রহার মর্মে গিয়ে বাজে। সে প্রহার অসহ্য!

মাত্র কি কৌতূহল, আর কিছু নয়? তুমি কি শুধু এইটুকুই দেখেছ, যে, একটি লোক মাত্র কৌতূহলের বশেই তোমার সব-কিছু জানতে চাইছে? তার বাইরে অন্য কি কিছুই ছিল না? ছিল না কি দরদ, ছিল না কি সমবেদনা, ছিল না কি স্নেহ? যদি এই খাকীর পোশাকটা না থাকত, তাহলে হয়ত তোমার বোঝার অসুবিধা হতো না!

নিজের মনেই বাদ-প্রতিবাদ করতে করতে খাঁ-সাহেবের সামনে গিয়ে যখন সেলাম করে দাঁড়ালাম, তখন যথেষ্ট দেরী হয়ে গেছে।

বললেন—কিছু কাগজপত্র জমা হয়ে আছে, কাজগুলো করে দাও।

কিছুটা লেখাপড়া-জানা কনস্টেবল বলে, থানার এল-সি'র কাজটা আমাকেই করে যেতে হয়, আজকাল থানায় অবশ্য 'এল-সি' বলে কোনো লোকও নেই। তবু, সাহেবের আদেশ শুনে আজ অবাক হলাম। প্রতিবাদ করার নিয়ম নেই, শুধু জিজ্ঞাসা করলাম—স্যর?

—কী?

—মেয়েটাকে নিয়ে বালুরঘাট যাবার কথা ছিল।

সাহেব বললেন—না-না, তুমি কেন যাবে? কাল তোমার যথেষ্ট পরিশ্রম গেছে। আমি পাঠিয়ে দিয়েছি মেয়েটিকে ভোর-বেলায়। এতক্ষণে অনেকদূর চলে গেছে তারা। মহাবীরকে দিয়েছি সঙ্গে।

মহাবীর!

চলে এলাম ওঁর সম্মুখ থেকে। মনে হলো, সমস্ত উৎসাহের দীপ্তি যেন মুহূর্তে মুছে গেছে। মেঘলা আকাশ যেন এক নিরানন্দের ছবি বলে মনে হতে লাগল, তরুশির-সঞ্চালন যেন এক আর্ত আকুতির মতো মনে হতে লাগল, আর ঐ পাখীর ডাক? ও যেন কারুর বুক-ফাটা কান্নারই নামান্তর।

যন্ত্রের মতো কাজ করে চলেছি, কাজে মন বসছে না বিন্দুমাত্র। মিনিটের পর মিনিট, ঘণ্টার পর ঘণ্টা কেটে গেল। সূর্য যখন ঠিক মাথার ওপরে, আকাশের মেঘমালা সরে গিয়ে রৌদ্র দেখা দিয়েছে যখন প্রখর হয়ে, তখন ফিরে এলো মহাবীর ঘর্মাক্ত কলেবরে। কাজ মিটিয়ে ও যখন সাহেবের ঘর থেকে বাইরে এলো, ওকে সন্তর্পণে ডেকে নিয়ে গেলাম অন্যদিকে, বললাম—দিয়ে এলে?

—হ্যাঁ।

—জেলে?

—হ্যাঁ, অবশ্য বালুরঘাট থানা হয়ে।

বললাম—কিসে গেলে?

চাপা গলায় বললে—কিসে আবার? বাস্ পেয়ে গেলাম। চলতি বাস্। এখান থেকে দেওতলা। সেখান থেকে বালুরঘাট।

জিজ্ঞাসা করলাম—কিছু বললে মেয়েটি?

—সেই পাত্তর কি না!—মহাবীর বললে—টের পাওনি?

মুখে একেবারে কুলুপ-আঁটা। সেই আলকাপের গান একটা মনে নেই—

মুখেতে কুলুপ-আঁটা কানে আঁটা তুলা
চেয়ারেতে বইস্যা আছে পুতুল কতগুলা—
কিবা কাল আনলে তুমি শিব হে।

কোন্ প্রসঙ্গে কী কথা আবার এনে ফেলল মহাবীর! বললাম—কিভাবে তুমি নিয়ে গেলে? কোমরে দড়ি দিয়ে?

—সে তো দিতে হবেই।—মহাবীর বললে—খাঁ সাহেবের মেজাজ তো জানোই!

একটু ক্ষুব্ধস্বরেই বলে উঠলাম—আগাগোড়া পথটা, বাসের মধ্যে, ওভাবে নিয়ে গেলে?

—হ্যাঁ, তাতে কী হয়েছে

সামলে নিয়ে, একটু থেমে, তারপরে বললাম—না, কিছু হয়নি।

সরে এলাম ওর কাছ থেকে। কিন্তু কী যে ওর হলো, ঘুরঘুর করে বারে বারে আসতে লাগল আমার কাছে। শেষে, বিকেলের দিকে আমাকে একা পেয়ে জিজ্ঞাসা করলে—ও-কথা তখন জিজ্ঞাসা করলে কেন সরকার?

ছুটির পর ওকে আবার একান্তে টেনে নিয়ে এলাম, বললাম—মেয়েটি আমাকে তার কথা কিছু বলেছে। ওদের সমাজে নিকে-বিয়ের চলন আছে। চার মাস পরে ও বেরিয়ে আসুক, তারপর ওকে তুমি বিয়ে করবে মহাবীর?

—ধ্যাৎ!—মহাবীর বললে—শেষে কয়েদীকে বিয়ে! পুলিস হয়ে! লোকে যে গায়ে থুথু দেবে!—

এবার ও-ই সরে গেল আমার কাছ থেকে।

দিনের পর দিন চলে যেতে লাগল। কে এক মেয়ে-কয়েদীকে

দেখেছিলাম কোনো একটি দিনের জন্য মাত্র, তাকে আমার অবশ্যই ভুলে যাওয়া উচিত। কিন্তু, বারবার মনে পড়তে থাকে তার কথা। শেষে এমন হলো যে, দুদিনের ছুটি নিয়ে চলে আসবার উদ্যোগ করলাম বাড়ি।

চলে আসছি, হঠাৎ মহাবীর এসে দাঁড়ালো আমার কাছে। আমার সুটকেশটা হাতে নিয়ে বললে—চলো, মাঠটা পার করে দিয়ে আসি তোমাকে।

মাঠের পারে এসে থমকে দাঁড়ালো মহাবীর, বললে—একটা কথা তোমাকে বলতে এলাম ভাই।

—কী ?

—সেই মেয়ে কয়েদীটির কথা তোমার মনে আছে ?

—হ্যাঁ। কেন ?

আমতা-আমতা করে মহাবীর বললে—একটু খোঁজ-খবর নিও তো। তোমার গাঁয়েই তো ওর শ্বশুরবাড়ি ছিল। যদি তেমন হয় তো,—

—বিয়ে করবে ?

মুখ ফুটে 'হ্যাঁ' বলতে বোধ হয় লজ্জা পেলো মহাবীর।

বললাম—ভেবে দেখি কী করতে পারি এ ব্যাপারে।

—না ভাই!—ও আমার হাত দুটো জড়িয়ে ধরল একেবারে, বললো—জানো তো আমার অবস্থা। আমি কস্মিনকালেও মেয়ে পাব না। যদি একে পাই তো, আমি রাজী।

এমন একটা অবস্থা, তবু পরিহাস করার লোভ সামলাতে পারলাম না। বললাম—কিন্তু জানো তো, ও চোর, যদি তোমার ঘরে বউ হয়ে এসে একদিন সব-কিছু চুরি করে নিয়ে পালায়।

—আরে রাম-রাম! মহাবীর বললে—সাবধানে বাক্স-প্যাঁটরায় কুলুপ এটে রাখতে হবে।

কোনক্রমে হাসি রোধ করে গম্ভীর কণ্ঠে বললাম—ঠিক আছে। আমি চেষ্টা করব। আচ্ছা, আসি ভাই।

স্যুটকেশটা হাতে নিয়ে হাঁটতে হাঁটতে গাড়িওয়ালা তাহেরের বাড়ির সেই মোড়ে এলাম, যেখান থেকে গাড়িতে উঠিয়ে দিয়ে ছিলাম পুতুলকে। একটুক্ষণ চুপচাপ দাঁড়িয়ে থেকে, তারপরে ডানদিকে পথ ধরলাম বাড়ির। অভাবিতরূপে আমাকে পেয়ে মা-বোন দুজনেই খুশি হবে। আর খুশি হবে রাধি। কাছে আসবে না, দূর থেকে দেখে ফিক্ করে হেসে, তারপরে ছুটে পালাবে।

আশ্চর্য, রাধির কথা মনে আসামাত্র, হঠাৎই প্রসন্ন হয়ে উঠল মন, বলা যায়, কিছুটা হালকাও হয়ে গেল। যেমন হৈ-হৈ করে বাড়ি ঢুকি, তেমনি করে ভিতরে গেলাম। মা রান্নাঘরের দাওয়ায় বসে তরকারি কুটছিল, আমাকে দেখে তাড়াতাড়ি বঁটিটা নামিয়ে রেখে এগিয়ে এলো, বললে—আস্‌ছিস তুই?

প্রণাম করলাম, বললাম—হ্যাঁ। শুভা কই?

বোনের নাম শোভা, কিন্তু হয়ে দাঁড়িয়েছে—শুভা। মা বললে—পাশের বাড়ি গেইছে, রাধির-ঘরের বাড়ি।

—ডাকবে না?

মা ওদের বেড়ার কাছে এগিয়ে গিয়ে ডাকতে লাগল—রে শুভা, শুভা!

বেড়ার ওপার থেকে সাড়া এলো—যাই মা।

—কাঁয় আইসছে, দেখ্।

কয়েক মুহূর্ত পরে দুমদাম করে পা ফেলে শুভা এসে উপস্থিত উঠোনের মাঝে। সে একা নয়, রাধিও আছে সঙ্গে। টান করে

খোঁপা বাঁধা, লাল ডুরে শাড়ি পরা, নাকে ছোট একটা ফুল, কানে রিং, গলায় হার, হাতে দু'গাছা করে সরু চুড়ি। আমি ততক্ষণে আমার ঘরের ভিতরে চলে এসে জানালার ফাঁক দিয়ে লুকিয়ে লুকিয়ে ওদের দেখছি।

শুভা বললে—কাঁয় মাও?

—ঘরে যায়া দ্যাখ ক্যানে?

পায়ে-পায়ে দু' বন্ধুতে এসে দাঁড়ালো ঘরে। তারপরে আমাকে দেখতে পেয়ে শুভা উঠল চেঁচিয়ে—দাদা!

আর রাধি করলো কী, প্রবল লজ্জা পেয়ে জিভ কেটে তাড়াতাড়ি পালাতে যাবে, আমি অমনি দু' হাত প্রসারিত করে দাঁড়ালাম দরজা আড়াল করে।

শুভা কৌতুক বোধ করে বলে উঠল ওর পিছন থেকে—কেমন মজা! যা' ক্যানে এইবার!

সরে গেছে রাধি শুভার পিছনে। ঝংকার দিয়ে বলে উঠল—কী নাগাছিস। তোর দাদাক্ সরি যাবার ক'।

—দাদা সইরবে ক্যানে, মুই সরি যাও।

বলেই, আমার হাতটা সরিয়ে ঘর থেকে ছুটে পালালো শুভা।

আমি রাধির দিকে দু'পা এগিয়ে গিয়ে বললাম—ভালোই হলো। তোমার সঙ্গে আমার একটা কথা আছে।

—না, মুই যাও।

—গেলে চলবে না, একটু দাঁড়িয়ে যেতে হবে।

অকারণে একেবারে কাঁদো-কাঁদো হয়ে গেল রাধির মুখ, বললে, —ক্যানে? এমন হইছেন ক্যানে? ছাড়ি দ্যান মোক।

বললাম—তোমাকে কি ধরে রেখেছি?

বলা মাত্র, ওর অবস্থা হলো, যেন ওর হাত দু'খানা আমি

সঙ্গে সঙ্গে খপ্ করে ধরেই ফেলেছি। দাঁড়িয়ে আছে বেশ দূরে, তবু হাতদুটো পিছনে করে একটু বেঁকে দাঁড়ালো। এক চমকে মনে হলো, বেশ ডাগরটি তো হয়ে উঠেছে রাধিটা! গায়ের রঙ তো ওর বরাবরই ফরসা, এবার যেন গালদুটি আপেলের মতো রাঙা হয়ে উঠেছে। আর, গড়ন-পেটনের দিক থেকে ওকে সুগঠিত সুন্দরী তরুণীর পর্যায়েই ফেলা যায়।

আমি দরজা থেকে সরে এসেছিলাম, আর ও এগিয়ে গিয়েছিল দরজার কাছটাতে। এবার ইচ্ছা করলে ও এক ছুটে ঘর থেকে বেরিয়ে যেতে পারে। কিন্তু, কী আশ্চর্য, তা' ও গেল না। মুখ ভার করে দাঁড়িয়ে থেকে বললে—ন্যান, কী চান কন।

বললাম—কইতে চাই না, দেখতে চাই শুধু।

—ধ্যাৎ!—বলে অপাঙ্গে দৃষ্টি নিক্ষেপ করলো আমার দিকে, গালের কাছটা টক্‌টকে লাল হয়ে উঠল, তারপরে, যা ভেবেছিলাম, সত্যিই ছুটে পালালো।

না, আর তাকে দেখিনি সারাদিন। দেখলে মন্দ হতো না, অথচ, সে যে চোখের সামনে এতক্ষণ আসেনি, সেজন্য কোথায় যেন ভিতরে ভিতরে স্বস্তির বাঁশীও বেজে চলেছে অনুক্ষণ।

মা বললে—তুই আস্‌ছিস্ শুনি রাধির বাপ আইস্‌পে রাত্তিরে কথা কবার।

অন্যমনস্ক ভাবেই বলে উঠলাম—কী কথা?

—তোর বিয়ার কথা। রাধিক আর ঘরত্ রাখা ভালো দেখায় না। ডাগর হইছে।

তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম—তুমি এক-এক সময় কী যে বলে ফেলো মা! শুভার বিয়ে না দিয়ে আমি বিয়ে করি কী করে? সমাজে নিন্দা হবে না?

মা একটু ভেবে বললে—কথাটা ঠিক-এ হয়। কওয়া যায় না,
রাধির থাকিয়াও শুভা ছয় মাসের বড়। তুই এক কাম কর ;
বঙ্গালবাড়ির রাজেন্দ্রের বাপক্ খৎ নেখি দে, ছৈলের ইস্কুল খ্যাষ
হইছে—আঘনে, আঘনে না হয় মাঘ·এ বিয়াটা য্যান হয়া যায়।
তোর আর উয়ার দোনোজনের বিয়া একে সাথে।

এখন চলছে আষাঢ় মাস, সুতরাং অগ্রাণ আসতে চার-চারটি
মাস বাকী। এই সময়টা হাতে থাকলে মন্দ নয়। কথাটা ভেবে
অনেকটা নিশ্চিন্ত বোধ করলাম, বললাম—এ যুক্তি মন্দ নয়।

—রাধির বাপক্ কমো ?

—বলো।

রাত্রে খাওয়া-দাওয়ার পর শুভা খাটে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে,
আমরা মাতা-পুত্রে কথা বলছি ; দাওয়ার ওপরে আমি শুয়ে, মা
বসে আছে শিয়রের কাছে, মাঝে মাঝে হাত বুলিয়ে দিচ্ছে মাথায়।
হঠাৎ বলে উঠলাম—মা।

—কী ?

তুললাম কথাটা। বললাম—এ পাড়ায় কিছুদিন আগে কে
একজন বেটাছেলে গলায় দড়ি দিয়েছে জানো ?

মা একটু ভেবে বললে—তাক্ আর জানি না ? খুব জানি।
তুই জানিস্ না ?

—না।

—দেখো ছাওয়ার কথা। পুলিস হছিস্, আর এই খবরটা
জানিস না ?

ধীরে ধীরে মা বলে গেল সব কথা। লোকটার বয়স পঞ্চাশের
কাছাকাছি হলেও স্বাস্থ্য ছিল চমৎকার। পাড়ার একেবারে
পশ্চিমধারে বাড়ি।

—মহেশ সিং-ওক্ মনে নাই তোর? ঐ যে তামাকপাতার বাগান আছে যার? আচ্ছা, কালিপদক্ মনে আছে? বারিক আছিল্, তোমরার রাজার দেওয়ান যা খবর দিয়া যাইতো, সেই খবর বিলি কইরতো বারিক। মনে নাই? তোর বাপের কাছে আইস্‌ত খৎ নেখাবার? সেই কালিপদ বাঁচি নাই। মহেশ সিং তারএ ব্যাটা। মহেশের মা-ও গেইছে অনেক দিন। বড়ো ভাই আছে দুইজন, সেই রংপুরে, পাকিস্তানে।

বললাম—এখনো তো চিনতে পারছি না, মা।

—কাক্ তুই চিনিস এই গেরামের!—মা বলে উঠল—থাকিস্ কতক্ষন? পুলিস হছিস, কিন্তুক্ খবর রাখিস না। ক্যামন পুলিস তুই? বলেই, সুর বদল করে মা একটু চাপা স্বরে বললে—মহেশের বইন সেই 'ধাম' নাচের দলে মিশি কুল ছাড়িয়া, কোটে চলি গেল? বছর সাত-আট আগের কথা, তোর মনে নাই? সেবার তুই ইস্কুল শ্যাষ করলু।

বললাম—তা হবে। কিন্তু রাখো ওসব কথা, গলায় দড়ি দিলো কেন, সেটা বলো?

—সে কারণটা মুই জানো না।—মা বললে—দারোগা জানিল্ না তো, মুই কোন ছার। পেটকাপড়ে খৎ রাইখ্‌ছে—ইয়ার জন্য কেউ দায়ীক না হয়।

—তা, গাঁয়ের লোক কী অনুমান করলে?

মা বললে—নোকে কইছে, মনে বিষ হছিল্ মহেশের। হবার নয়? বাচ্চা হয়া-হয়া মরি যায়, তাবিজ-কবজে বউয়ের হাত ভরি দিলে, শ্যাষ বয়সে হৈলে এক বেটি। তা, ফুটফুটা ছয় বছরের হৈল্। কিন্তুক, সে সুখ কপালে ন্যাকা নাই। বউ থাকে, শাশুড়ী থাকে ঘরে, দিনে রাইতে কামড়া-কামড়ি—দাওয়ায় কাকচিল

বইসবার পারে না। তারপর হইল্ এক বিত্তান্ত। বছর না ঘুরইতে মহেশের ঘরে হইল এক চুরি।

—চুরি!—তাড়াতাড়ি উঠে বসলাম, বললাম—কী চুরি?

—গয়না। বউয়ের তামাম গয়না চুরি গেল।

—কে করল? চোর ধরা পড়ে নি?

—পইড়ছে।—মা বললে—একটা বেটিছাওয়া উয়ার বাড়ি যাওয়া-আইসা করছিল, পুছ্তে তাঁয় কয় যে এটা মোর ভাতারের ঘর। বেটি ছাওয়াটা আসিয়া আঙ্নাত যেমন বইসছে আর নাগি গেল যতো ঝগড়া-কাজিয়া। মহেশ আসিয়া, ফির বেটি ছাওয়াটাক নিয়া চলি গেইলে তখন নিয়া শান্তি।

বেশ বুঝতে পারলাম কার কথা বলছে মা। একে-একে সবই শুনে নিলাম মা-র কাছ থেকে। মা বললে—'পাপ কথা ছাপি না অয়, ওইদ বাতাসের আগোত যায়'।

মেয়েটি, অর্থাৎ, ভামিনী নাকি মহেশের বিয়ে করা বউ নয়, রক্ষিতার মতো। সে-ই এসে বউয়ের গয়না একদিন চুরি করে নিয়ে গিয়েছিল, "হাতে-নাতে" তাকে ধরে ফেলেছিল পুলিস। কয়েদ হয়ে গেছে তার এক বছর। বউ বললে—সে নাকি দাগী চোর। আরেকবার আম চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়েছিল মালদহের কোন্ বাগানে, নাবালিকা বলে হাকিম ছেড়ে দিয়েছিল সেবার। আরও কতো-কী চুরি করেছিল, কে জানে! কিন্তু, এ ছাড়া, আরও খবর আছে। মা জানালো, কিছুদিন আগে পুলিস গাঁয়ে নিয়ে এসেছিল মেয়েটাকে মহেশের বউয়ের কাছে। পুলিস নাকি কয়েদ শেষ হবার আগেই মেয়েটিকে ছেড়ে দিয়েছে। বউ বললে—জাত ডাইনী, পুলিসের চোখে মন্ত্র-পড়া ধূলি দিয়েছে! মা-র কাছে এ-ও শুনলাম, বউ নাকি দু'বছরের মেয়েটাকে কাছছাড়া করছে না, তার ভয়,

এবার কোনদিন সে এসে মেয়ে চুরি করে নিয়ে পালাবে। বলে—নিজের পেটের ছা' তো নাই, পরের ছা-য়ের দিকে শিয়ালের চোখ!

শুনে গেলাম সব মায়ের কাছ থেকে ধীর চিত্তে। শুনতে শুনতে কেন যেন ঘৃণা এলো না তার ওপর, কেন যেন আরও মায়া জন্মাতে লাগল। মনে হলো, সত্যি কথা এরাও কেউ জানে না, সত্যি কথা লুকিয়ে আছে একমাত্র তারই অন্তরে, কিন্তু কে দেবে সেখানে নাড়া, যাতে করে তার কথা-ফুলগুলি ঝর ঝর করে ঝরে পড়বে!

পরদিন সকাল হতে-না-হতেই বেড়িয়ে পড়লাম বাড়ি থেকে। ঘুরতে ঘুরতে গেলাম মহেশের বাড়ি। দেখলাম, আমি কাউকে না চিনলেও, পাড়ার অনেকেই আমাকে চেনে। মহেশের বউ, শাশুড়ী, এমন কি ছোট দু'বছরের মেয়েটাকেও প্রত্যক্ষ করে এলাম। আশেপাশের পড়শীদের কাছ থেকে যা শুনতে পেলাম, তা মায়ের বর্ণনারই অনুরূপ, এমন কি স্থানে-স্থানে মায়ের ভাষণকেও ছাড়িয়ে যায়। একজন বললে—মহেশের সেই ভাবের বেটিছাওয়াটা নাম-করা চোর। কতো যে চুরি কইরছে, তার নেখাজোখা নাই, পুলিস এ যাবৎ হদিসএ পায় নাই, এইবার মহেশের বাড়ির গয়নাসমেৎ হাতেনাতে ধরি ফেলাইছে।

চলে এলাম। ভিতরটা কেমন যেন অস্থির হয়ে রয়েছে সর্বক্ষণ। শুভা এক সময় চুপি চুপি একটা বেলফুলের মালা নিয়ে এলো, বললে—নে দাদা, রাধি দিছে।

—কই রাধি?

—তাঁর বাড়িত্।

—ডেকে আন্ না।

—আউ আউ! নজ্জা নাগে না! বলে, রাধির বদলে

শুভাই যেন লজ্জায় কাতর হয়ে ছুটে পালালো। আমি উঠলাম, বললাম—মা, আমি একটু ঘুরে আসছি। ফিরতে রাত হবে। ভাবনা কোরো না।

—কোটে যাইস্? থানাত্?

—হ্যাঁ।

মিথ্যা কথাই বললাম। বলে, তাহেরের বাড়ির পাশ দিয়ে বড়ো রাস্তায় এসে কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে, একটা বাস্ ধরে চলে এলাম একেবারে পাণ্ডুয়া।

সেই বাড়ি। পুতুলের বাপের বাড়ি। পরনে আজ আমার সাধারণ ধুতি-শার্ট, পুলিস বলে চেনা একেবারেই সহজ নয়।

বাড়িটা আমার মনে ছিল, বিশেষ খুঁজতে হলো না। একটি ছোট ছেলে বাইরে দাঁড়িয়েছিল, তাকে বললাম—বাড়ির কর্তাকে ডেকে দাও তো।

ছেলেটা ভিতরে গেল। বাইরে থেকে যতদূর দেখা যায়, খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে দেখতে লাগলাম বাড়িটাকে। যেমন কুঁড়েঘর এ অঞ্চলে হয়, তেমনিই বাড়ি, তবে ভয়ানক জীর্ণ। সব মিলিয়ে যেটুকু লক্ষ্য পড়ে, তাতে মনে হয়, প্রবল দারিদ্র্য-দশা বুঝি অনড় হয়ে বসে রয়েছে গৃহবাসীদের ওপরে। সেদিন যখন পুতুলকে নিয়ে আসি, তখন এ সব অনুভব করার মতো মন ছিল না আমার। আজকের আগ্রহ, আজকের সমবেদনা, এ অনুভব করে আমি নিজেই যাচ্ছি অবাক হয়ে ভিতরে ভিতরে।

বৃদ্ধটি একসময় এলেন বাইরে, বললেন—কে?

তারপরে পরিচয় পেয়ে সমাদর করে ডেকে নিয়ে গেলেন বাড়ির মধ্যে। উঠোনের প্রান্তে বসলাম এক চারপায়ার

ওপরে। চার-পাঁচটি নগ্ন ছেলেপিলে ঘোরাঘুরি করছিল এপাশে-ওপাশে, বৃদ্ধ বললেন—নাতি-নাতনী সব। মেয়ের ঘরের। বড় মেয়ে বিধবা হয়ে এসে গলায় ঝুলে আছে এতগুলি ছেলে-পিলে নিয়ে।

বললাম—আচ্ছা? বিধবা বিয়ের তো চল আছে আপনাদের সমাজে?

—তা আছে বাবা, কিন্তু ও মেয়ে তাতে কান দেয় না।

বৃদ্ধের কথায় রীতিমত এদেশীয় টান, কিন্তু আমার সঙ্গে কথা বলছেন, ওরা যাকে বলে, 'বইয়ের ভাষায়'। নিজের হাতে এক গেলাস চা নিয়ে এসে আমার সামনে নামিয়ে রাখলেন, বললেন—খাও বাবা।

তারপরে, যখন বৈকালের আলো মিলিয়ে গিয়ে সন্ধ্যা নেমে আসতে লাগল, উনিও বলতে লাগলেন ওঁর সব কথা। ভুঁই আছে সামান্য, তাতে সম্বৎসরের খোরাকী চলে না। বয়স্ক-শিক্ষাব যে ইস্কুল হয়েছে গাঁয়ে, তাতে সামান্য একটু মাস্টারীর কাজ জুটেছে সম্প্রতি, দু-চার পয়সা তাতে যদি আসে, তাতে যদি কিছু সুরাহা হয় সংসারের।

বললেন—অন্য মেয়েরা যে-যার শ্বশুরঘর করছে, ছোট মেয়েটির এবার বিয়ে দিলেই হয়। বর-ঘরও ঠিক, কিন্তু আমার ন'মেয়ে পুতুলই আমার কু-গ্রহ। দিদি কয়েদী শুনলে কী আর ওর বোনের বিয়ে হবে? ও ফিরে এলে ওকে তো ঘরে রাখা চলবে না। কিন্তু কোথায়ই বা যাবে ও? এর থেকে, বাপ হয়ে বলছি, মেয়ের আমার মরণ হলেই ছিল ভালো।

বলতে বলতে গলাটা ধরে এলো বৃদ্ধের। নামটা ইতিমধ্যে জেনে নিয়েছি। বলরাম। বলরাম দাস। বললাম—দেখুন, পুলিস

হিসাবে আসিনি কিন্তু, এমনি এসেছি। মেয়েটি বিধবা হলো হঠাৎ, অথচ জেল থেকে ছুটি পেতে হলো তার দেরি, যখন এসে পৌঁছল, তখন শ্রাদ্ধ-শ্রান্তি পর্যন্ত হয়ে বসে আছে। এটা দেখে, নিজেকেই বড়ো অপরাধী মনে হচ্ছে। আপনার কাছে বলতে সংকোচ করবো না, মনের এমন অবস্থা, হয়ত এ চাকরি ছেড়েই দেবো। আমিও রাজবংশী, না হয় ক্ষেত-খামারে মন দেবো, তরিতরকারি বুনব মাঠে, তামাকপাতা বুনব।

সুকঠিন বিস্ময়ে আমার দিকে তাকিয়ে স্তব্ধ হয়ে রইলেন কিছুক্ষণ বলরাম দাস।

এ রকম কথা যে আমি বলতে পারব, এ তিনি আশাই করেননি সম্ভবতঃ।

বললাম—আঁধার হয়ে এলো, আমি ফিরে যাবো আবার সেই গাজোল। তাই সংক্ষেপে আপনাকে জানাচ্ছি, পুতুল ফিরে এলে, ওকে আমি বিয়ে দেওয়াবো আমার এক বন্ধুর সঙ্গে। সেই বন্ধুকে আমি রাজীও করিয়ে রেখেছি।

এবার আবেগে যেন অভিভূত হয়ে পড়লেন বৃদ্ধ, হাতদুটো ধরে বলে উঠলেন—

তাহলে আমি তোমার কেনা গোলাম হয়ে থাকবো বাবা, শত হলেও বাপ তো! কতদিন উপোস করে থেকেছে, পেটে দুটো খেতে দিতে পারি নি।

বললাম—আচ্ছা, আপনার মেয়ে কি সত্যিই চুরি করেছিল?

চোখ মুছে বললেন—করেছিল বাবা, মিথ্যে বললে জিভ আমার খসে যাবে।—সতীনের গয়না চুরি করে এনেছিল।

—আপনার বাড়িতে?

—না। রাস্তাতেই ধরা পড়ে পুলিসের হাতে।—কান্নাভরা

কণ্ঠে বৃদ্ধ বলরাম বলতে থাকেন—পেটের দায়ে বাবা, নিছক পেটের দায়ে। আর কেউ না জানুক, আমি তো জানি!

বৃদ্ধকে বেশী প্রশ্ন করলে আরও কাতর হয়ে পড়তে পারেন বুঝে, যে প্রশ্নটুকু না করলে নয়, সেটাই এবার করে বসলাম—আচ্ছা, মহেশ সিং কি আপনার মেয়েকে বিয়ে করেছিল?

স্তব্ধ হয়ে রইলেন বলরাম দাস।

বললাম—তাহলে লোকে যা বলে, সেটাই সত্য কথা?

বলরাম গম্ভীর কণ্ঠে বললেন—বিয়ের কথা আমিও জানি না বাবা, তবে মেয়ে বলতো, বিয়ে হয়েছিল নাকি গোপনে।

বললাম—রাজবংশীর সঙ্গে দেশী মেয়ের বিয়েই বা হলো কী করে?

—ভগবান জানেন।

বললাম—আপনি এর কিছুই জানেন না বাপ হয়ে?

স্থির হয়ে রইলেন বহুক্ষণ। মনে হলো, অতি কষ্টে বুঝি শান্ত করছেন নিজেকে।

তারপরে নিজে থেকেই বললেন এক সময়—মেয়েকে এক মুসলমান ধরে নিয়ে গিয়েছিল।

—কী বললেন!

—হ্যাঁ। বিয়ে শাদী যা হবার সেখান থেকেই হয়েছে। ও-মেয়ে গোড়া থেকে বাইরে হয়ে গেছে সমাজের।

এবার নীরব হবার পালা আমার। কিছুক্ষণ কেটেও গেল নিস্তব্ধতার মধ্য দিয়ে। বৃদ্ধ বললেন—তোমার মতো লোক বড়ো একটা দেখা যায় না। কী নাম যেন তোমার বাবা? ভুলে গেছি। বাড়িতে কে-কে আছেন?

যথাসম্ভব সব উত্তরই দিলাম একে একে। তারপরে বলে

উঠলাম—আর একটি মাত্র কথা। সেই মুসলমানের ঠিকানা জানা আছে আপনার ?

—জানি বাবা। বড়ো দরগাহ—ছোট গরদাহ—সোনা মসজিদ যেখানে আছে—তারই কিছু দূরে একখানি মসজিদের কাছাকাছি মুসলমানপাড়ায় খোঁজ করলে গজব আলির নাম যে কেউ বলে দেবে।

—আপনি কখনো ওখানে, মানে, ওর কাছে গিয়েছিলেন ?

দীর্ঘশ্বাস ফেলে বৃদ্ধ বললেন—না। তাকে দেখিওনি কোন-দিন। শুনেছি।

বললাম—সেখান থেকেই বিয়ে হলো ?

—মেয়ে তো তাই বলে।

বললাম—মহেশ সিংয়ের যথেষ্ট উদারতা ছিল বলতে হবে।

—মেয়ে তো সেকথা বলে, তবে মহেশকে তো কোনদিন ঘর করতে দেখলাম না ওকে নিয়ে। মেয়ে ছুটে ছুটে গেছে গাজোলে, তাড়া খেয়ে চলে এসেছে।

বললাম—এরপরে সে কোথায় থাকত ? আপনার বাড়িতে ?

—হ্যাঁ, কোথায় আর থাকবে। মণ্ডলে জরিমানা দিয়ে জাতে উঠেছিলাম কোনক্রমে, কিন্তু এখন আবার কী যে হবে জানি না ! কী বিচার হবে তা-ও জানি না, জরিমানার টাকা আসবে কোথা থেকে, তা-ও জানি না।

বললাম—মেয়েকে এক মুসলমান যে ধরে নিয়ে গিয়েছিল, তার প্রতিকার করার কিছু চেষ্টা করেন নি ?

—না।

—কেন ?

বৃদ্ধ বলরাম বললেন—করব কী ? মেয়ে বললে—ও পাড়ায়

কেউ তার কোনো অনিষ্ট করে নি। এমন কি জাতও যায় নি তার। মেয়ে তখন সাবালিকা, জোর করে কোনো-কিছু বলি কী করে?

রাত হয়ে আসছিল, উঠে পড়লাম। একবার মনে হলো, মুসলমানপাড়ায় গিয়ে গজব আলিকে খুঁজে বার করলে কেমন হয়? কিন্তু পরক্ষণেই মনে হলো, কী হবে জেনে? সত্যের একটু আলোকরেখা মাঝে মাঝে বিচ্ছুরিত হয়ে ফুটে উঠেছে, কিন্তু আবার তা' সংশয়ের ঘনঘটায় যাচ্ছে ঢেকে। বারে বারে মনে হচ্ছিল, যা ওরা সবাই বলছে, তা' বুঝি সত্য হয়েও পুরোপুরি সত্য নয়। সত্য আছে একমাত্র তারই অন্তরে লুকিয়ে, সে মুখ ফুটে না বললে, কারুর কোনো ক্ষমতাই নেই কিছু জানবার। গজব আলিও হয়ত এমন কিছু বলে বসবে, যাতে করে আর সব ঢেকে গিয়ে প্রখর হয়ে উঠবে ওরই অপরাধ।

এ এক আশ্চর্য অপরাধীর সন্ধান আমি পেয়েছি, যার অপরাধ-গুলি নিঃসীম আকাশে নক্ষত্রের মতো জ্বলজ্বল করে চোখের সামনে ভেসে উঠলেও, তার সত্তার মাধুর্য তার অপরাধ-সীমাকে যাচ্ছে পার হয়ে, সেখানে সে সব-কিছুর ঊর্ধ্বে, সেখানে সে অনন্য।

এই অনন্য মানুষটির সন্ধান কি কোনদিন পাবে মহাবীর? পেতেও পারে। সচ্ছন্দ, সহজ জীবন পেলে ঘোর অপরাধীও তার অপরাধ-সাধন থেকে দূরে থাকতে পারে, একথা আমাদের থানার আগেকার দারোগা মিত্তির সাহেবের কাছে বহুবার শুনেছি। পুতুল যদি অপরাধ-প্রবণ মানুষই হয়ে থাকে তো, মহাবীরের জীবন-ছায়ায় সে সেসব ভুলে গিয়ে তার প্রকৃত সত্তায় আবার মহীয়ান হয়ে উঠতে পারে, এ বিশ্বাস অন্তরে পোষণ করা কি মূঢ়তা?

সেদিন সারারাত পথ দিয়ে একা হেঁটে ফিরে এসেছি বাড়ি। একা হেঁটে হেঁটে আসছি নির্জন পথ দিয়ে, পাশ দিয়ে দু'তিনটি জীপ গাড়ি চলে গেল, সার দিয়ে চলেছে গরুর গাড়ির পর গরুর গাড়ি, একটা ঘোড়ার গাড়িও বুঝি এক সময় চলে গেল পাশ কাটিয়ে। কিন্তু ভ্রূক্ষেপ নেই আমার কোন দিকে। আমি যেন সঞ্চারিত এক স্বপ্ন নিয়ে সম্মোহিতের মতো পথ হেঁটে চলেছি! নীড় বেঁধে দেবো তোমার, সংসার হবে তোমার, আবার ভাল হয়ে উঠবে তুমি, কোলে আসবে তোমার সোনার মতো এক ছেলে! আমি সেদিন আর পুলিস নই, ক্ষেত-খামারের মানুষ, ধূলিমাখা ছুটি পায়ে হেঁটে এসে উঠব তোমার কুটিরে, বলবো—ঘটিটা দেখি বন্ধু, কুয়োতলায় গিয়ে পা-দুটো ধুয়ে আসি।

মহাবীর খুশিতে হৈ-হৈ করে উঠবে, বলবে—কুয়ো নয়, টিউকল।

নানান রকম এলোমেলো কথা ভাবতে ভাবতে বাড়ি গিয়ে যখন পৌঁছলাম, তখন রাত অনেক। পরদিন সকালে উঠে হাত-মুখ ধুয়ে ঘরের মধ্যে চা নিয়ে বসেছি, শুভা এলো চুপি চুপি কাছে। ফিসফিসিয়ে বললে—দাদা!

—কী?

হাতের মুঠি খুলে ছোট একটা ভাঁজ-করা কাগজ রাখল আমার সামনে, বললে—রাখি দিছে।

বলেই আর দাঁড়ালো না, এক ছুটে বেরিয়ে গেল ঘর থেকে। রীতিমত অবাকই হয়ে উঠি ভাঁজ-করা কাগজটা খুলতে খুলতে। এ একেবারে অভাবিত ঘটনা! সপ্তাহে-সপ্তাহে বাড়িতে তো আসি, কখনো তো এমনটি করেনি রাখি! দেখি, কাগজে লিখেছে

স্বাক্ষর-বিহীন একটি মাত্র বাক্য : "কাল রাত্রে এত দেরি করলেন কেন ফিরতে ?"

বিস্ময় বটে, আনন্দও কম নয়। কয়েকটি মাত্র অক্ষর, কিন্তু নির্ভুল। তাছাড়া, হস্তাক্ষরও ভারী সুন্দর হয়ে উঠেছে রাধির। গাঁয়ে আমাদের প্রাথমিক বিদ্যালয় হয়েছে, ছেলেমেয়েরা পড়ে। মেয়েরা বড়ো হলে আর যায় না। সাধারণতঃ পড়াশুনারও সঙ্গে সঙ্গে তাদের ঘটে ইতি।

তবে কী, বাড়িতে বসে পড়াশুনার চর্চাটা অব্যাহত রেখে চলেছে রাধি ? মনটা এত প্রসন্ন হয়ে উঠল যে, খুশি-ভরা কণ্ঠে চেঁচিয়ে ডেকে উঠলাম—শুভা !

—কী ?

—আয় না !

এলো। বললাম—আন্ না একটু ডেকে ?

শুভা যে না বুঝল এমন নয়, তবু, যেন কিছু বোঝে নি, এমন ভাব করে জিজ্ঞাসা করে উঠল—কাকে ?—রাধিকে ?

ফিক্ করে এবার হেসে ফেলল শুভা, বলল—বাপরে এতদূর ? খারা হন, মা'ক্ ডাকিয়া কয়া দিতোছি।

—এই খবরদার !—লজ্জিত মুখে উঠে দাঁড়িয়ে ওকে কৃত্রিম তাড়া দিতে গেলাম, ও খিলখিল করে হাসতে হাসতে ছুটে পালালো, কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে মা এসে দাঁড়ালো ঘরের মধ্যে। থমথমে গম্ভীর তার মুখ। একটু বিস্মিত হয়েই প্রশ্ন করলাম—কী মা ?

মা বললে—কাইল এ-পাড়াত আসছিল তাহের। মোক দেখি দুইটা কথা কয়া গেল। মহেশ সিংয়ের বেটিছাওয়াটাক্ গাড়ি করি সদর নিয়া গেছিস্ তুই ?

—হ্যাঁ। থানার হুকুম ছিল।

—বেটিছাওয়াটাক্ তা হইলে পুলিশ ছাড়ি দিলেনা ক্যানে?

—কয়েদী যে। ছাড়বে কেন?

মা তুলল কূট প্রশ্ন—তা, কাইল কথাটা তুই গোপন করলু ক্যানে?

প্রথমটা কেমন যেন অপ্রস্তুত হয়ে পড়লাম কথাটা শুনে। উল্‌টোপাল্‌টা কী যে বললাম কৈফিয়তের সুরে, নিজের কানেই তা বেসুরো শোনালো। মা তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতেই পর্যবেক্ষণ করলো আমার ভাবভঙ্গি, তারপর পাকা মোক্তারের মতো আব্বার প্রশ্ন করে বসল—সাত-সাত বছর পুলিস হছিস, ছুটি নিয়া ঘরত বস্‌ছিস্ কবে? একটা দিনও তা' হইলে এইবার ঘরত আছিস ক্যানে? কোটে গেছলু কাইল রাইতে?

—কেন বলো তো মা? এত কথা জিজ্ঞাসা করছ কেন?

হঠাৎ কেন যেন কান্নাভরা শোনালো মায়ের স্বর, বললে—বুকটা ডরি উঠে। মোর আর আছেটা কাঁয়? তুই ছাড়া? রাধির বাপ আসিয়া কইলে, তুই বাস্-গাড়ি করি সদরের দিকে চলি গেছিস। তার পাছে সাঁঝের দিকে আসছিল তাহের। তার মুখে খালি মুই ক্যানে, রাধির বাপ-মা, আরও কাঁয় কাঁয় সব শুনলে মহেশ সিংয়ের বেটিছাওয়াটার খবর। শুনিয়া বুকটা ডরায় না?

মায়ের দুশ্চিন্তা দেখে বড় মায়া হলো। উঠে মাকে দু'হাতে ধরে বসিয়ে দিলাম মাদুরের ওপরে। বললাম—শোনো মা, তোমাকে সব বলি।

তারপরে একে-একে সব কথাই খুলে বললাম মাকে। একেবারে প্রতিটি সংবাদ পুতুলের সম্পর্কে। মহাবীরের সঙ্গে যে তার বিয়ে

দিয়ে তাকে আমি স্থিতি করে দিতে চাই, এ-কথাও বলতে ভুললাম না। ভুললাম না একথাও বলতে যে বালুরঘাট জেলে আছে সে, চার মাসের দিন পনেরো আগেই ছাড়া পাবে।

সব শুনে, মা গেল স্থির হয়ে। কাহিনী-অন্তে শুধু দীর্ঘশ্বাস ফেলে বললে,—নাম বুঝি পুতুল?

—ভামিনী। ডাক নাম পুতুল।

কিছু আর বলল না মা, উঠে গেল, মুখখানা তার তখনো অস্বাভাবিক গাম্ভীর্যে থমথম করছে।

অবাক হয়ে মায়ের এই অভাবিত আচরণের কথাই ভাবছি কিছুক্ষণ ধরে, এমন সময় পায়ে পায়ে ঘরে এলো শুভা, এসে একেবারে পাশে বসে পড়ল।

বললে—রাধি আস্‌ছিল্।

—কেন?

—তুই যে কছলু? মাও আছে দেখিয়া ফিরি গেল।

বললাম—এখন তো বেলা হয়ে গেছে; বিকালে আসতে বলিস। আজ আর কোথাও বেরুবো না।

শুভা একটুক্ষণ চুপ করে থেকে হঠাৎ চাপা গলায় ফিসফিস করে বললে—রাধি পুছ্‌ করছিল—ওই চোর মাইয়াটা দেইখতে কেমন?

সোজা হয়ে উঠে বসলাম তাড়াতাড়ি। বললাম—কোন্ চোর-মেয়েটা?

—ঐ যে তাহের-চাচা কয়া গেল?

স্তম্ভিত হয়ে বসে রইলাম। এই নিয়ে গাঁয়ে যে এখন কানা-কানি চলবে, এটা আর বুঝতে বাকী রইল না। এবং, সেকথা

ক্রমশঃ কী কথায় এসে দাঁড়াতে পারে, সেটা ভেবেও শঙ্কিত হলাম মনে মনে।

বিকেলে রাধি এলো চুপি চুপি, মা যখন পুকুরঘাটে গা ধুতে গেছে, তখন। লাল ডুরে শাড়িটা পরা, খোঁপায় একটা ছোট্ট বেলফুলের মালা জড়ানো, কপালে কাচপোকার টিপ্। এসে লজ্জিত ভঙ্গিমায় ভীরু চোখ-তুটি তুলে বললে—শুভা কোণ্টে?

—পুকুরে। মা-র সঙ্গে গেছে।

অমনি বুঝি পিছিয়ে গেছে তু'পা। বললে—মুই যাঁও।

একটু হেসে বললাম—ভয় কেন? সামনের অঘ্রাণে, কিংবা, মাঘে—

—যান!—বলে, ছুটে পালালো তাড়াতাড়ি। কিন্তু মন আবার বললে, ভারী স্থন্দর হয়ে উঠেছে তো রাধিটা!

পরদিনই চলে আসতে হলো থানায়।—গাজোলে। বাড়ি এলাম আবার পরের রবিবার। মা বললে—রাধির বাপ কইলে একটা কথা।

—কী কথা?

—কইলে আঘন নোয়ায়, পুতের বিয়া ছ্যান এখন-এ। আষাঢ়ের শেষাশেষি দিন আছে।

প্রবল চমকে কেঁপে উঠলাম যেন। রাধির তরুণ যৌবন-লাবণ্য আমাকে তো মুগ্ধই করেছে, তবু অন্তর থেকে কে যেন আর্তকণ্ঠে বলে উঠল—না-না, তা হয় না।

—না-না, তা হয় না! মাকে বললাম—শুভার বিয়ে না দিয়ে আমি বিয়ে করব না।

মা আর কিছু বলেনি সেদিন। পরের রবিবার কী-কাজে আটকে গিয়ে আর যেতে পারিনি বাড়ি, গেলাম তারও পরের

রবিবার। আগের রবিবার কেন আসিনি, সে সব কৈফিয়ৎ নেবার পর মা বললে—বঙ্গালবাড়িত খৎ লেখাছি রাধির বাপক্ দিয়া। জবাব আইসছে। শাওনের পোত্থম তারিখেই দিন পইড়ছে বিয়ার। তাঁর আপত্তি নাই। খালি বিয়ার পাছে, মাইয়া থাইকবে মোর কাছে, রাজেন্দ্রের ইস্কুল শ্যাষ হইলে তবে নিয়া যাইবে শ্বশুর বাড়ীত্। এই সত্ত।

বললাম—তুমি শুভার কথা বলছ?

—হয়, আর কার কথা কমো?

মনটা কেন যেন হঠাৎই আনন্দে ভরপুর হয়ে গেল। কতো কী হাস্যপরিহাস করতে লাগলাম শুভার সঙ্গে। আমার জ্বালাতনে শেষ পর্যন্ত শুভা এক সময় কেঁদেই ফেলল—তাড়াবার পাইরলে তো বাঁচেন তোমরা!

যেন এক প্রবল মত্ততার মধ্য দিয়ে কেটে গেল দিন। এলো শ্রাবণের প্রথম সপ্তাহের সেই বিশেষ দিনটি। কাকারা এলো, আত্মীয়-স্বজন এলো, বালুরঘাট থেকে মেজো বোন এলো, জামাই এলো, ঘনঘোর বর্ষাও নামল সেদিন। বর এলো, সবাই বললে—বাছুলে বর। বিয়ে করে শুভাকে নিয়ে চলে গেল রাজেন্দ্র। আমাদের ঘরও যেন সঙ্গে সঙ্গে গেল শূন্য হয়ে। মায়ের কান্নার স্পর্শে আমারও চোখ উঠল সজল হয়ে। রাধি তা লক্ষ্য করে, পাশ ঘেঁষে যাবার সময় সবার অলক্ষ্যে চুপি চুপি বলে গেল একটি কথা—পুরুষমাইন্ষের চোখে জল ক্যানে?

তাড়াতাড়ি মুছে ফেললাম চোখ। চোখের কান্না দূর হলেও মনের কান্না কি দূরে যায়? কোন্ বইয়ে যেন পড়েছিলাম কথাটা। হঠাৎ এই সময় তা মনে পড়ে গেল।

মেজো জামাই আগেই চলে গেছে তার কাজ আছে বলে।

মেজো বোন আর তার ছেলেমেয়েকে আমিই পৌঁছে দিতে গেলাম বালুরঘাটে। হিলির রাস্তা ধরে খানিকটা চলে, তারপরে বাঁ-ধারে নামতে হয়। একটু চলেই বোনের শ্বশুরবাড়ি, আত্রেয়ী নদীর কাছ বরাবর। বোনকে পৌঁছে দিয়ে চলে আসছি, ভবানীচকের চৌমাথাটা পেরিয়েছি মনে আছে, হঠাৎ দেখি, অন্যমনস্কভাবে পথ চলতে চলতে এসে পড়েছি বালুরঘাট সাব-জেলের দরজার কাছে। সেই লোহার রড্-সাজানো জেলের ফটক, তার পিছনে অনুরূপ আরেকটি ফটক, তার অন্তরালে কোথায় কোন্ কক্ষপ্রান্তে বসে হাতের কাজ করতে করতে হঠাৎ আনমনা হয়ে সে তার অদৃষ্টের কথা ভেবে চলেছে, কে জানে! শ্রাবণের সবে প্রথম, কার্তিক শেষ হলে তার চার মাসের ঘটবে সমাপ্তি। কিন্তু দশদিন আগেই সে ছাড়া পাবে। দশদিন কেন, আরও পাঁচদিন—মোটমাট পনেরো দিন। যেমন ঠাণ্ডা মেয়ে সে, আরও পাঁচদিন রেহাই পাওয়া তার পক্ষে আদৌ কঠিন হবে না। তাহলে, ধরা যেতে পারে, কার্তিকের মাঝামাঝি সে পাবে মুক্তি। আন্দাজ করে ঠিক সেইদিনটিতে আমি যদি এসে দাঁড়াই ফটকের সামনে, আর পুতুল বেরিয়ে এসে প্রথমেই মুখ তুলে যদি দেখতে পায় আমাকে তো কেমন হয়?

চিন্তাটা আমাকে অধিকার করে বসল তীব্র নেশার মতো। আসতেই হবে আমাকে কার্তিকের মাঝামাঝি এই জেলের ফটকে। কিন্তু কবে আসবে কার্তিকের সেই শুভ দিনটি?

পরের সপ্তাহে বাড়ি গেছি, চুপচাপ এই কথাই ভেবেছি। তারও পরের সপ্তাহে গেছি, দেখি, শুভা সেই যে এসেছে 'অস্টম দিনে', তারপরে আর শ্বশুরবাড়ি যায় নি। রাজেন্দ্রের পরীক্ষা না হওয়া পর্যন্ত সে যাবেও না। সিঁথিতে সিঁদুর পরে শুভাকে দেখতে

হয়েছে অপরূপ। দেখে মনে হচ্ছে, এই কি সেই শুভা, যে শিশু-বয়সে রেগে গেলে পরনের কাপড়টা খুলে ফেলে দাওয়ায় পা ছড়িয়ে কাঁদতে বসত!

একথা মনে করিয়ে দিতে, যুগপৎ লজ্জা ও রাগে লাফিয়ে-ঝাঁপিয়ে সে এক দৃশ্যেরই অবতারণা করল বটে শুভা, বলে উঠল—আউ আউ, দাদাটা কী অসভ্য াড়ান ক্যানে, মুঁইও হাটে হাঁড়ি ভাঙি দিতোছি। জানিস মা, দাদা কী কছিলো—রাধিক চুপচুপ করি ডাকি দে।

কথাগুলো এমন চেঁচিয়ে বলতে লাগল যে, এবার সত্যিই করতে লাগল আমার লজ্জা। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে অবাক হলাম শুভার ভাবভঙ্গী দেখে, মাত্র আটদিন বঙ্গালবাড়িতে থেকে ওর কথার ভঙ্গিও বদলে গেল নাকি? আমার সাহচর্যে রাধিও অমন বদলে যাবে! মেয়েরা বুঝি এমনি করেই বদলে যায়? তাহলে তো তাকেও অন্য মানুষ করে তোলা যায় সহজে! জেলের পর মেয়েরা যাতে নির্ব্বিঘ্নে ভালভাবে জীবিকা-অর্জন করতে পারে, তার জন্য নতুন-সব প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে শুনেছি, কিন্তু কেমন সে-সব জানি না। সে-সব জায়গায় থেকে মেয়েরা কি সুখী হতে পারে? যতো কাজ শেখানোই হোক না কেন, যতো ভালো ব্যবহারই করা হোক না কেন, মেয়েদের নিঃসঙ্গতা কি ঘোচে? কখনো-কখনো ওসব মেয়েদের সম্বন্ধ করে প্রতিষ্ঠান থেকে বিয়েও দিয়ে দেওয়া হয় শুনেছি, কিন্তু আজ কেন যেন মনে হচ্ছে, বিয়েতেই কি সব সমস্যার সমাধান? জেল-খাটা মেয়ে যদি স্বামীর ঘরে এসে স্বামীর প্রকৃত ভালোবাসা না পায়, শ্রদ্ধা না পায়? ভালবাসার ভিত্তি যে শ্রদ্ধার ওপর প্রতিষ্ঠিত, এ আমি অনেক বইয়ের অনেক ঘটনা পড়ে মনে মনে বুঝে নিয়েছিলাম।

মাত্র দেহ-সঙ্গিনী হয়েই কি সুখী হয় মেয়েরা? আমার তা' মনে হয় না।

মায়ের মনে বইছে অন্য এক স্রোতের প্রবাহ। বললে—রাধির বাপ আস্ছিল। তোর বিয়ার সম্বন্ধে। শাওনের শ্যাষে একটা দিন আছে। তার পাছে ভাদর—ভাদর মাসে বিয়া হয় না। মুঁই কথা দিছো। ছুটি নে তুই।

আকাশ থেকে পড়লাম যেন। ঠিক সেই মুহূর্তেই কথা হলো না। কথা হলো আরও পরে, রাত্রের দিকে, প্রস্তাবটি মা যখন পুনরাবৃত্তি করে শোনালো, সেই তখন। বললাম—বিয়ে এখন করব না। কার্তিকটা পেরিয়ে যাক।

সে প্রবল কথা-কাটাকাটি, মান-অভিমানের বিস্তৃত বর্ণনা দিয়ে লাভ নেই। মা আমার বুদ্ধিমতী,' কিন্তু রেগে গেলে মায়েরও দেখলাম দিগ্বিদিক জ্ঞান থাকে না। চিৎকার করে কেঁদে উঠে নিদারুণ উত্তেজনায় বলতে লাগল মা,—বুঝছি, সেই ডাইনী তোর মাথা খাইছে। তাক্ তুই বিয়া করিয়া ঘরে উঠাবু। তার আগে মুঁই দিম্ গলাত দড়ি।

—মা! বুকের ভিতরটায় কে যেন তীক্ষ্ণ ছুরিকাঘাত করেছে অকস্মাৎ। আর্তকণ্ঠে শুধু 'মা' বলে ডেকেই আমি চুপ করে গেলাম, তারপরে আর দাঁড়িয়ে না থেকে হন্‌হন্ করে হেঁটে সোজা চলে এলাম থানায়, ব্যারাকে। মহাবীর জেগে ছিল, বিস্মিত হয়ে বলল—কী ব্যাপার হে? এত রাত্রে?

রুদ্ধকণ্ঠে বললাম—তোমার সঙ্গে কথা আছে মহাবীর।

উঠে বসল সে—কী কথা?

বললাম তাকে সব খুলে। কার্তিকের মাঝামাঝি। যাবে তুমি বালুরঘাট জেলের দরজায়। দুদিন আগেই না হয় যাবে।

ছুটি নিয়ে গিয়ে বসে থাকবে ওখানে। তার সঙ্গে তোমার দেখা হওয়া চাই। পেতে যদি চাও তাকে, এক মুহূর্তও সময় নষ্ট করো না।

বিস্মিত হয়ে আমার মুখের দিকে তাকিয়ে রইল মহাবীর। ওর দুটি কাঁধ ধরে ঝাঁকি দিয়ে বলে উঠলাম উত্তেজিত কণ্ঠে—কী, বিয়ে করবে না ওকে ?

—হ্যাঁ! করব তো!

—তবে সচেষ্ট হও। নইলে সে হাতছাড়া হয়ে যেতে পারে তোমার।

বিস্ময়ের ঘোর তার তখনো কাটেনি। বললে—সবে শাওন মাস, এখনো দেরি আছে।

ভাদ্র আব আশ্বিন, মাঝে এই দু'টো মাস।

মহাবীর বললে—শাওনের আজ পনেবোই। তাছাড়া, ওদিকে কার্তিকের পনেরোটা দিনও ধরো। তাহলে আছে তিনটি মাস।

বিরক্তস্বরে বললাম—তুমি কি এখন হিসেব নিয়ে বসলে নাকি?

শুয়ে পড়ল মহাবীর, বললে—না, শাদী আমি করব ঠিক।

পরদিন। আশা করছিলাম, বাড়ি থেকে কেউ আসবে খোঁজ করতে। অন্ততঃ আসবে রাধির বাপ। কিন্তু কেউ এলো না, সেদিনও না, তার পরদিনও না। এলো রবিবার। গেলাম না। তারপরে দেখতে দেখতে শ্রাবণ মাসও কেটে গেল। এলো ভাদ্র। কতদিন আর অভিমান ভরে মুখ ফিরিয়ে থাকা যায়। গেলাম বাড়ি। মায়ের গাম্ভীর্য অটুট। মা অবশ্য ও বিষয়ে আর কিছু বলল না, বলল শুভা। বললে—এতদিন আসেন নাই ক্যানে দাদা ?

—তোমাদেরও তো কেউ খোঁজ করতে গেল না।

—কাঁয় যায় ক' তো? কাঁয় আছে পুরুষমানুষ এইটে তুই ছাড়া?

বলতে বলতে ওর গলাটা যেন ধরে এলো।

বললাম—রাধির বাপও তো যেতে পারত!

—ছাই যাইবে।—ঝংকার দিয়ে উঠল শুভা—তোমাকে নিয়া কী-সব শুনছে, কয়, রাধিক হামি অন্য জাগাত বিয়া দেম।

মুখ তুলে তাকালাম ওর দিকে। বললাম—রাধি কি বলে?

—তাঁয়-ও বাপের বেটি। কয়, বিয়া কইরমোয় না।

একমুহূর্ত স্থির হয়ে ভেবে নিলাম বিষয়টা। তারপরে, উঠে দাঁড়ালাম। ও অবাক হয়ে বললে—কোটে যান?

—রাধিদের বাড়ি।

তাড়াতাড়ি বলে উঠল শুভা—সে যাবার হয়, পাছে যান। এমন উতালা না হন।

—হবো না কেন বলতে পারিস!—রুদ্ধ কণ্ঠে বলে উঠলাম—মা অমন মুখ ফিরিয়ে থাকে। কেন থাকে বুঝতে পারিস না? কষ্ট হয় না? মা ছাড়া কে আর আছে আমাদের?

বলতে বলতে আমারই চোখে জল এসে গেল, প্রায় ছুটেই চলে গেলাম ওদের বাড়ি চোখ মুছতে মুছতে। রাধির বাপ বাড়িতেই ছিল। যা বলবার, সব বলে এলাম। বলে এলাম—কথা দিচ্ছি, ওর আর নড়চড় হবে না। আপনি জোগাড়-যন্ত্র করুন, অগ্রানের প্রথম বিয়ের তারিখে শুভকাজটা হয়ে যাক।

আমার সঙ্গে কথা বলে, ওঁরও বুঝি কেটে গেল মনের মেঘ। আনন্দে আমাকে একেবারে জড়িয়েই ধরলেন বৃদ্ধ। মুহূর্তের জন্য দেখা জানলার ধারের দুটি খুশী-হওয়া চোখের দৃষ্টিও আমাকে জানালো নীরব অভিনন্দন। আমার নিজের মনটাও হয়ে গেল

লাম্‌। বাড়ী এসে ছুটে গেলাম একেবারে মায়ের কাছে, সব কথা বিবৃত করে তারপরে বললাম—খুশি হওনি মা ?

তেমনি আশ্চর্য বিরস মুখ মায়ের, বললে—মোর আর সুখ কী ? তোর সুখে মোর সুখ।

বিকেলে শুভা এলো ছুটতে ছুটতে। বললে—রাধি কী কইছে জানেন ? কইলে—তোর দাদা মানুষটা খুব ভালোয় হয়।

এততেও গেল না মনের ভার। এলাম থানায়। যথারীতি কাটতে লাগল দিন। পূজো এলো, চলে গেল। কার্তিক আসি-আসি করছে। আবার অনুভব করছি মনের সেই নিদারুণ অস্থিরতা। মহাবীরকে ডেকে বললাম—বিয়ে তুমি ওকে করবে তো মহাবীর ?

—হাঁ, করব।

যতো দিন এগিয়ে আসে, ততই যেন প্রমত্ত হয়ে উঠি। পুতুলের বিয়ে কোনক্রমে না দিয়ে আমার যেন স্বস্তি নেই। ঘুম নেই, জাগরণ নেই, সব সময় চোখের সামনে ভেসে ওঠে সেই থান-পরা বিষণ্ণ মূর্তিখানা। ভেসে ওঠে সেই ম্লান মুখখানি। তুমি দাগী চোর, তুমি চুরির অভ্যাসের দাস, এ আমার কিছুতেই মনে হয় না। কোথায় যেন সবার ভুল হয়ে গেছে তোমাকে বিচার করতে গিয়ে। মহেশের ভুল হয়েছে, গজব আলির ভুল হয়েছে, বলরাম দাসের ভুল হয়েছে। ওকে যে পাবে, সে ভাগ্যবান।

কিন্তু পরক্ষণেই চমকে উঠলাম। ছি—ছি! এ-ই বা ভাবছি কী আমি বসে বসে ? তবে কি মা যা ইঙ্গিত করেছিল ক্রোধান্বিত মুহূর্তে, সেটাই সত্যি ? আমি কি নিজেই পুতুলকে বিয়ে করে ঘরে আনতে চাই ? তা না হলে 'ওকে যে পাবে, সে ভাগ্যবান',

এ কথাটা অন্তরের পটভূমিকায় হঠাৎই জ্বলজ্বল্ করে উঠল কীভাবে ?

আবার গিয়ে ধরলাম মহাবীরকে। বললাম—যাও তুমি মহাবীর, বালুরঘাটে চলে যাও ছুটি নিয়ে। না হয় দু'দিন আগেই গেলে !

ও আমার অবস্থা দেখে কী বুঝল কে জানে, বললে—তা, তুমিই যাও না কেন নিজে ?

—ছি—ছি—কী বলছ !—যেন নিজের অশান্ত মনটাকে কশাঘাত করে শান্ত করতে চাইছি, বললাম—আমি চাই, তুমি যাও। তুমি ওকে অধিকার করো। তুমি ওকে নিয়ে সংসার পাতো। সুখী হও।

তাই হলো। ঠিক সেদিনই রওনা হলো না মহাবীর, হলো আরও কয়েকদিন পরে। আমি, মাঝে যে রবিবার পড়ল, সেদিন গেলাম না বাড়িতে। ব্যারাকেই আছি, একবার ঘর একবার বার করছি। এবং যেদিন তার ছুটির শেষে থানায় এসে কাজে যোগদান করবার কথা সেদিনও না এসে পরায় ভয়ানক অস্থির হয়ে উঠলাম ভিতরে-ভিতরে। কী হলো ওদের ? তাছাড়া, এদিকে খাঁ সাহেব যদি ওর খোঁজ করেন, তাহলেই বা বলব কী ? যদি তাঁর অভ্যস্ত সুরে বলেন—আজই না জয়েন করবার কথা মহাবীরের ? দেশে গিয়ে ঘরে বসে খুব মজা লুটছে বুঝি ?

কী বলব ?—বলব—মহাবীরের কেউ কোথাও নেই। ও গিয়ে থাকবে কোথায় ?

ঠিক এর পরদিন, যখন বিনিদ্র রাত ছট্‌ফট্ করে কাটিয়ে, সকালে উঠে স্নান করে নিজের সীটে এসে বসেছি এমন সময় শুষ্ক

মুখে, চুপিচুপি লুকিয়ে যেন অপরাধীর মতো কাছে এসে দাঁড়ালো মহাবীর। চোখদুটি লালচে, মাথার চুল এলোমেলো, ভাবেভঙ্গীতে উদ্বেগের চিহ্ন সুস্পষ্ট, বললে—খোঁজ করেছিলেন খাঁ সাহেব?

—না।—বলে ওকে সঙ্গে নিয়ে চলে গেলাম বারান্দার এক-প্রান্তে। ওখানে একটা বেঞ্চি পাতা থাকত, সেখানে ওকে বসিয়ে প্রশ্ন করলাম, কী হলো? দেরি হলো কেন?

মহাবীর হঠাৎ ব্যাকুল হয়ে আমার হাতদুটো জড়িয়ে ধরল, বললো—ভাই, সে আমাকে বিয়ে করবে না।

একটু অবাক হয়েই ওর মুখের দিকে তাকালাম, বললাম—কিন্তু কোথায় সে? ছাড়া পেলো কবে?

—ছাড়া পেয়েছে কাল।—মহাবীর একটু দম নিয়ে বললে—নিজের পয়সা খরচা করে ওকে নিয়ে এলাম একটা ঘোড়ার গাড়ি করে। এতটা পথ আসতে কি চায় গাড়ি? আছি তো সাদা পোশাকে, পুলিস বলে পরিচয় দেবারও উপায় নেই। কয়েদী-মেয়ের সঙ্গে আবার পুলিশ কেন? নানান্ লোক নানান্ কথা বলবে! নইলে, একবার দেখে নিতাম গাড়িওয়ালাকে! বেয়াদবি বার করে দিতাম।

আরও কতো-কী বলতে যাচ্ছিল মহাবীর, আমি জোর করে থামিয়ে দিলাম ওকে। বললাম—এখন সে কোথায়? বাপের বাড়ি?

—না। বললে—বাপ তাকে নেবে না।

—তবে?

মহাবীর বললে সে কী এখানে! ঐ পাণ্ডুয়া গ্রাম ছাড়িয়ে, একলাখী মসজিদের দিকে এক মুসলমানপাড়ায়।

—এখানে আসতে চাইল না?

—না।

—আমার কথা বললো? আমার সঙ্গে একটিবার দেখা করতে চাইল না?

—না।—মহাবীর সখেদে বললে—মেয়েটি বোধ হয় মুসলমান হয়ে যাবে হে।

ভিতরে ভিতরে বোধ করছিলাম অদ্ভুত এক উত্তেজনা। আমাকে এরই মধ্যে সে ভুলে গেল? একটিবারও জিজ্ঞাসা করলে না আমার কথা?

কিন্তু সে ভাব প্রকাশ না করে যথাসম্ভব শান্তকণ্ঠেই প্রশ্ন করলাম তোমাকে বিয়ে করতে চায় না বলেছে?

—হ্যাঁ।

—তুমি কী বললে?

—বললাম।—মহাবীর বললে—অনেক করে বললাম, আমি তোমার গায়ে হাত দেবো না, তোমাকে সুখে রাখব, তোমার কোনো অভাব রাখব না। যা যা বলার দরকার, সব বলেছি।

একটুক্ষণ থেমে থেকে বললাম—চলো মহাবীর বেরিয়ে পড়ি।

—কোথায়?

বললাম—গজব আলির বাড়ি।

ও অবাক হয়ে প্রশ্ন করল…কে গজব আলি?

বললাম—যার বাড়িতে ও গেছে। দেখলে না একটি মুসলমান ছোকরাকে?

ও ততোধিক আশ্চর্য হয়ে বললে…না ত! দেখলাম—এক বুড়ো মুসলমানকে। ওকে সঙ্গে করে ভিতরে নিয়ে গেল।

—বুড়ো!—একটু ভেবে নিয়ে বললাম…কী জানি, কী ব্যাপার! কিন্তু, এ-ভাবে বসে থাকলে চলবে? এসো, ছুটি

নিই দু-চার দিনের জন্য। বিয়ের তারিখ-টারিখ না থাকে না থাকবে, ইংরেজবাজারে গিয়ে রেজিস্ট্রারের কাছে খাতায় নাম লিখিয়ে বিয়ে করবে। আমি হবো সাক্ষী, চলো।

ও বললে—বলছ কী তুমি! এই ছুটি নিলাম, এরপর আরও ছুটি দেবে খাঁ সাহেব? চড়-চাপড় লাগাবে।

বললাম—চুপ করে দেখেই যাও না, আমি কী করি! বলব—ছুটি দিন স্যর, মহাবীরের বিয়ে দিয়ে আসি।

—সর্বনাশ!—মহাবীর বললে—তুমি সব খুলে বলবে ত? যদি কেউ জানতে পারে, কয়েদী বিয়ে করছি, তাহলেই হয়ে গেল আমার চাকরি! হয়ে গেল সদরে গিয়ে হেড কনস্টেবল হওয়া! সবাই যে জানতে পেরে গায়ে থুথু দেবে। একটুক্ষণ থেমে থেকে তারপরে ওর চোখের দিকে তাকিয়ে বললাম—ভয় পাচ্ছ?

—না, তা ঠিক নয়,—মহাবীর বললে—তবে, ও যে কয়েদী, এটা কাউকে জানাতে চাই না। ওকে লুকিয়ে রাখব ঘরের মধ্যে। মুসলমানদের মতো পর্দানসীনা করে। কিন্তু, এ সবই বা আর ভাবছ কেন ভাই? ও বললে—তুমি আমায় সেবার রাত্রে থানায় আনবার সময় মেরেছ, তোমাকে বিয়ে করব না।

হেসে বললাম ওর কথার ধরনে। ও একটু ব্যথিত হয়ে বললে—তুমি হাসছ? সত্যি বলছি, ও বলেছে, ও আমাকে কিছুতেই বিয়ে করবে না।

বললাম—ওটা আমার ওপর ছেড়ে দাও, চলো আমার সঙ্গে।

—এখুনি কী? দাঁড়াও, বাক্সটা খুলি, পোস্টাপিসের বইটা বার করি, সদরে গিয়ে টাকা তুলতে হবে না?

থানায় তখন খুব একটা কাজের চাপ ছিল না, কাছাকাছি ভারী কোনো চুরি-ডাকাতি হয় নি জেনে খাঁ সাহেবেরও মেজাজ

ছিল ভালো। সুতরাং, ছুটি পেতে অসুবিধা হলো না। বিশেষ করে, মহাবীরের যে বিয়ে হচ্ছে, এ খবর শুনে তিনি খুশিই হলেন। ক'নের কথা বার বার জিজ্ঞাসা করা সত্ত্বেও আমরা সঠিক উত্তর দিলাম না। অন্য এক কাহিনী বললাম বানিয়ে। বললাম—'বিয়ে সদরে। ওদেরই জাতের এক মেয়ে। অতি কষ্টে সংগ্রহ করা হয়েছে। এ না হলে, বিয়ে-হওয়াটা শক্ত ছিল মহাবীরের পক্ষে। জাতের দিক থেকে ও হয়ে পড়েছে, যাকে বলে—না ঘরকা না ঘাটকা!'—ওর বিয়েটা সহজে হওয়া সম্ভব ছিল না।

তারপরের ঘটনা সংক্ষিপ্ত। পথে গিয়ে বাস-এ উঠলাম, বসলাম পাশাপাশি। ও বললে—একটা বেড়া তো পার হলে। এরপর? মিছেই তোমার চেষ্টা, ও মেয়েকে যতদূর বুঝেছি, ও রাজী হবে না।

—দেখা যাক।

দেখা হলো আবার এতদিন পরে। সেই রকম থানই পরনে। চেহারা সেইরকম বিশুষ্ক-বিষণ্ণ, মনে হলো যেন আরও ভেঙে পড়েছে্ আমাকে দেখে একটু যেন অবাক হলো, কিন্তু সে ভাবটা তাড়াতাড়ি সামলে নিয়ে, চোখ নামিয়ে বললে···ভালো আছেন?

—আছি।

—এলেন যে?

—কথা আছে।

—কী কথা?

বললাম—তোমার বিয়ে দিতে এসেছি।

ও চট্ করে দুটি চোখ তুলে তাকালো আমার দিকে পরিপূর্ণ দৃষ্টিতে বললে—কেন?

উত্তর দিতে পারলাম না। ও-ও প্রশ্ন করল না আর কিছু।

কেমন যেন অদ্ভুত নির্জন জায়গাটা। আমবাগান একদিকে, আর একদিকে আমাদের বরিন্দ অঞ্চলের সেই সরু সরু সব বাঁশের গাছ, যাকে কাব্য করে আমি বলতাম—বেণুবন। এক পাশে একটা পোড়ো মসজিদ, আর মসজিদের লাগোয়া ছোট্ট এই বাড়িটা। পাকা মেঝে, মাটির দেওয়াল, খড়ের চাল। বহু পুরাতন কোনো ভিত্তিভূমির ওপরে নতুন গড়ে তোলা একফালি উঠোনঘেরা ছোট্ট একটি কুঁড়েঘর। উঠোনে মুরগী বেড়াচ্ছে ঘুরে তার শাবকবৃন্দ নিয়ে। বললাম—বাড়িতে মেয়ে ছেলে কেউ আর নেই?

—না।

বলে উঠলাম—কোথায় গজব আলি?

একটু যেন চমকেই উঠলো, তারপরে ঠোঁটের কোণে একটু হাসি টেনে বললে—তার কথা আবার জানলেন কোথা থেকে?

বললাম—জেনেছি। তোমার সব-কিছুই জেনেছি। মহেশ সিং-এর কথাও জানতে বাকী নেই, তোমার গয়না-চুরির কথাও অজানিত নেই।

ম্লান একটু হেসে বললে—তাহলে ত সত্যিই সব জেনেছেন। বাঁচা গেল।

বললাম—দেখা হবে ছোকরার সঙ্গে?

—কে ছোকরা?

—গজব আলি। যার টানে তুমি এখানে ছুটে এসেছ?

আমার দিকে তাকিয়ে রইল অনেকক্ষণ। চোখদুটি যেন কৌতুকে নাচছে।

বললে—ছোকরা নয়। ঐ যে দেখুন। এসে পড়েছেন।

উঠোনের আগাড়টা ঠেলে ভিতরে এসে দাঁড়িয়েছেন এক বৃদ্ধ, পক্ককেশ শ্মশ্রুগুম্ফ, বয়স সত্তরের কম কিছুতেই হবে না।

ধীরে ধীরে এগিয়ে এলেন আমাদের কাছে। আমরা তখন সাধারণ বেশ-বাসে আছি, দেখা মাত্রই আমাদের যে কেউ 'পুলিশ বলে চিনে নেবে, এমন উপায় ছিল না। বৃদ্ধ আমাদের থেকে দীর্ঘদেহী, কাঁধের কাছ থেকে ঈষৎ নত হয়ে পড়েছেন বার্দ্ধক্যের ভারে। আমাদের দিকে তাকিয়ে হাসি মুখে বলে উঠলেন—নমস্কার। আপনারা পুতুলের বাপের বাড়ী থেকে এসেছেন বুঝি?

আমরা কোনো উত্তর দেবার আগেই পুতুল বলে উঠল—না আব্বা, এঁরা পুলিশের লোক।

একটু যেন চমকে উঠলেন, কিন্তু মুখের হাসিটি ঠোঁটের প্রান্ত থেকে তবু মিলিয়ে গেল না। বললেন—খোঁজ খবর নিতে এসেছেন?

এবারও পুতুল যেন কী বলতে গিয়েছিল, কিন্তু তার কথাটাকে চাপা দিয়ে আমি তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম—না-না, একেবারেই না!

মহাবীরের সঙ্গে এক মুহূর্তের দৃষ্টি বিনিময় করে নিয়ে বললাম—দেখুন, পুলিসের লোক হিসাবে ও'কে চিনতাম ঠিকই, কিন্তু সে পরিচয় নিয়ে আসিনি। এসেছি আপনার সঙ্গে আলাপ-পরিচয় করতে মাত্র।

তেমনি সহাস্যে বলে উঠলেন বৃদ্ধ, বেশ-বেশ, খুবই ভালো কথা। মানুষ মানুষের সঙ্গে আলাপ পরিচয় করে বই কী? ব'লেই পুতুলের দিকে মুখ ফেরালেন তিনি, বললেন—একটা মাদুর বের করে দাও ত মা, আমরা ঐ মস্‌জিদের চত্বরে গিয়ে বসি।

—দিচ্ছি বাবা।

বলে, পুতুল চলে গেল ভিতরে। আমি সংগোপনে আবার দৃষ্টি-বিনিময় করলাম মহাবীরের সঙ্গে। গজব আলির প্রসঙ্গে ওর মুখে যে কালীমার ছায়া ফুটে উঠতে দেখেছিলাম, এখন তা তিরোহিত। 'বাবা' আব্বা' ইত্যাদি বলে পুতুল যখন সম্বোধন করছে বৃদ্ধকে, তখন মহাবীরের পক্ষে পুতুল সম্বন্ধে কুৎসিত আর কিছু ভাববার অবকাশ রইলই না বলে মনে হয়!

পুতুল মাদুর নিয়ে এলো, সেই মাদুর হাত বাড়িয়ে নিলেন গজব আলি, তারপরে বললেন—মেহমান এসেছেন গরীব-খানায়, তুমি মা একটু সরবৎ করে খাওয়াও এঁদের।

—আচ্ছা বাবা। —বলে, ঘরের ভিতরে চলে গেল পুতুল।

আমরা এসে বসলাম মস্‌জিদের চত্বরে মাদুর পেতে। বললেন এখানে বসে একটু বিশ্রাম করা যাক, কেমন? —বেশ ত।

কথাবার্তায় আচার-ব্যবহারে গজব আলিকে শুধু মার্জিত রুচিই নয়, অদ্ভুৎ সারল্যে ভরা মানুষ বলে মনে হচ্ছিল।

বললেন—আমার কেউ কোথাও নেই, ঐ পুতুল কোথা থেকে এসে হঠাৎ জড়িয়ে পড়ল জীবনে!

মহাবীর এযাবৎ একটি কথাও বলেনি, হঠাৎ এইবার বলে উঠল—আপনি শাদী করেননি?

—না।

—কেন?

একটু হেসে বলতে লাগলেন—আমরা এদিককার লোক নই, আমরা মুসলমান, তবে দিল্লী-আগ্রা অঞ্চলের। আব্বাজানের হাত ধরে একদিন মা-হারা শিশুটি এদেশে এসেছিলাম, সেই থেকে রয়ে গেছি। বাংলাভাষা ভালোই বলতে পারি, কলকাতা প্রায়ই

যেতে হয় কাজ-কারবার উপলক্ষ্যে, সেইজন্য রপ্ত হয়ে গেছে কলকাতার ভাষা।

ইতিমধ্যে হু'বার হেটে এসে পুতুল তিনগ্লাস ঘোলের সরবৎ দিয়ে গেল আমাদের [illegible]। সঙ্গে একটা প্লেটে করে কিছু নারকেল-নাড়ু, এবং একঘটি ঠাণ্ডা জল।

শুধু এই নয়, সে রাত্রে ওখানেই রইলাম, মসজিদের চত্বরে মাহুর পেতে হুজনে শুয়ে। গজব আলিও শুয়ে রইলেন আমাদের পাশে।

শোবার আগে আহারের পর্বও ভালোভাবে সমাধা হয়ে গেছে। কিছুদূর পর্যন্ত হেটে এসে একটা দোকানে বসিয়ে আমাদের রুটি-টুটি খাওয়ালেন গজব আলি, কিছু নিয়েও গেলেন পুতুলের জন্য।

বললেন—আপনাদের অসুবিধা হলো খুব কিন্তু কী করব, হিন্দুর দোকান ভালো আর এদিকে একটিও নেই। বেটীকে বললাম—মেহমানদের খানা পাকিয়ে দে মা ভালো করে। তা' বললে—আমার হাতে ওরা খাবে কী?

আমি তাকালাম মহাবীরের দিকে, মহাবীর আমার দিকে। 'ওর হাতে খেতে আমাদেব আপত্তি নেই',—একথা জোর ক'রে আমি বা মহাবীর কেউই বলতে পারলাম না। এবং কেন যে পারলাম না, তা জানি না। জানি না বলে আজও ঘটনাটা ভাবতে গিয়ে অবাক হই! কোন্ বিচিত্র মানসিকতা আমাদের হুজনের মধ্যে সেদিন কাজ করছিল কে জানে।

শুয়ে শুয়ে সব কথাই হলো একে একে। এমন কি, আমাদের এভাবে এসে পড়ার কী উদ্দেশ্য, তা-ও বললাম। বললাম এবার ও নিজে রাজী হলেই হয়!

বলে, পুতুল চলে গেল ভিতরে। আমি সংগোপনে আবার দৃষ্টি-বিনিময় করলাম মহাবীরের সঙ্গে। গজব আলির প্রসঙ্গে ওর মুখে যে কালীমার ছায়া ফুটে উঠতে দেখেছিলাম, এখন তা তিরোহিত। 'বাবা' আব্বা' ইত্যাদি বলে পুতুল যখন সম্বোধন করছে বৃদ্ধকে, তখন মহাবীরের পক্ষে পুতুল সম্বন্ধে কুৎসিত আর কিছু ভাববার অবকাশ রইলই না বলে মনে হয়!

পুতুল মাছুর নিয়ে এলো, সেই মাছুর হাত বাড়িয়ে নিলেন গজব আলি, তারপরে বললেন—মেহমান এসেছেন গরীব-খানায়, তুমি মা একটু সরবৎ করে খাওয়াও এঁদের।

—আচ্ছা বাবা। —বলে, ঘরের ভিতরে চলে গেল পুতুল।

আমরা এসে বসলাম মস্‌জিদের চত্বরে মাছুর পেতে। বললেন এখানে বসে একটু বিশ্রাম করা যাক, কেমন? —বেশ ত।

কথাবার্তায় আচার-ব্যবহারে গজব আলিকে শুধু মার্জিত রুচিই নয়, অদ্ভুৎ সারল্যে ভরা মানুষ বলে মনে হচ্ছিল।

বললেন—আমার কেউ কোথাও নেই, ঐ পুতুল কোথা থেকে এসে হঠাৎ জড়িয়ে পড়ল জীবনে!

মহাবীর এযাবৎ একটি কথাও বলেনি, হঠাৎ এইবার বলে উঠল—আপনি শাদী করেননি?

—না।

—কেন?

একটু হেসে বলতে লাগলেন—আমরা এদিককার লোক নই, আমরা মুসলমান, তবে দিল্লী-আগ্রা অঞ্চলের। আব্বাজানের হাত ধরে একদিন মা-হারা শিশুটি এদেশে এসেছিলাম, সেই থেকে রয়ে গেছি। বাংলাভাষা ভালোই বলতে পারি, কলকাতা প্রায়ই

যেতে হয় কাজ-কারবার উপলক্ষ্যে, সেইজন্ত রপ্ত হয়ে গেছে কলকাতার ভাষা।

ইতিমধ্যে হু'বার হেটে এসে পুতুল তিনগ্লাস ঘোলের সরবৎ দিয়ে গেল আমাদের তিনজনকে। সঙ্গে একটা প্লেটে করে কিছু নারকেল-নাড়ু, এবং একঘটি ঠাণ্ডা জল।

শুধু এই নয়, সে রাত্রে ওখানেই রইলাম, মসজিদের চত্বরে মাহুর পেতে হুজনে শুয়ে। গজব আলিও শুয়ে রইলেন আমাদের পাশে।

শোবার আগে আহারের পর্বও ভালোভাবে সমাধা হয়ে গেছে। কিছুদূর পর্যন্ত হেটে এসে একটা দোকানে বসিয়ে আমাদের রুটি-টুটি খাওয়ালেন গজব আলি, কিছু নিয়েও গেলেন পুতুলের জন্ত।

বললেন—আপনাদের অসুবিধা হলো খুব কিন্তু কী করব, হিন্দুর দোকান ভালো আর এদিকে একটিও নেই। বেটীকে বললাম—মেহমানদের খানা পাকিয়ে দে মা ভালো করে। তা' বললে—আমার হাতে ওরা খাবে কী?

আমি তাকালাম মহাবীরের দিকে, মহাবীর আমার দিকে। 'ওর হাতে খেতে আমাদের আপত্তি নেই',—একথা জোর ক'রে আমি বা মহাবীর কেউই বলতে পারলাম না। এবং কেন যে পারলাম না, তা জানি না। জানি না বলে আজও ঘটনাটা ভাবতে গিয়ে অবাক হই! কোন্ বিচিত্র মানসিকতা আমাদের হুজনের মধ্যে সেদিন কাজ করছিল কে জানে।

শুয়ে শুয়ে সব কথাই হলো একে একে। এমন কি, আমাদের এভাবে এসে পড়ার কী উদ্দেশ্য, তা-ও বললাম। বললাম এবার ও নিজে রাজী হলেই হয়!

বৃদ্ধ ততক্ষণে উঠে বসেছেন, বললেন—শাদী ?

হ্যাঁ।

একটুক্ষণ চুপ করে থেকে বৃদ্ধ বললেন—ও রাজী হচ্ছে না ?

বললাম—এখনো সোজাসুজি কথাটা ঠিক বলিনি। যতটুকু বলেছি, তাতে ওর দিক থেকে কোনো সাড়া পাইনি।

মহাবীরও উঠে বসেছে, বললে—আপনার এখানে আসবার আগে ওকে আমি নিজে প্রস্তাব করেছিলাম, ও কিছুতেই রাজী হয় নাই।

বললাম—এবার হবে। যদি আপনার আপত্তি না থাকে।

তাড়াতাড়ি বলে উঠলেন—আমার আপত্তি কেন হবে ?

—আপনার সম্মতি আছে ?

—হ্যাঁ।

মনে মনে যেন ভারমুক্ত হলাম মনে হলো। তারপরে আরও সব কথা হলো। কিন্তু, পুতুলকে উনি কী ভাবে এখানে নিয়ে এসেছিলেন, কীভাবে পেয়েছিলেন ওকে, সেটাই হলো না জানা। জিজ্ঞাসা করতেও সংকোচ হলো, যদি মন্দ সংবাদ কিছু শুনতে হয় ! যদি জানা যায়, বলরাম দাস যে-ইঙ্গিত করেছিলেন, সেটাই সত্যি। তাহলে লজ্জা আর রাখব কোথায় ? মহাবীরও বা ভেবে বসবে কী ? অথচ, বৃদ্ধের মুখের দিকে তাকিয়ে, বৃদ্ধের মুখের ঐ 'মা' ডাক শুনে, ও কথা বিশ্বাস করতে সত্যিই মন চায় না !

যাই হোক, শেষ পর্যন্ত সাত পাঁচ ভেবে ও-প্রসঙ্গ চাপা দিয়ে রাখাই যুক্তিযুক্ত মনে করলাম। বৃদ্ধ কিন্তু কথা প্রসঙ্গে নিজে থেকেই বলে ফেললেন একটি কথা। বললেন—মহেশ সিং বলে একটি লোকও ওকে এখানে দেখে মুগ্ধ হয়েছিল, বিয়ে করতে চেয়ে

ছিল। আমি কেন আপত্তি করব? ও হিন্দুর মেয়ে, আমি আপত্তি করবারই বা কে?

বললাম—মহেশ সিং-এর সঙ্গে ওর সত্যিই বিয়ে হয়েছিল?

—হয়েছিল বইকী!—বৃদ্ধ বললেন—কথাটা ত কেউ বিশ্বাস করল না, আদালতও করল না। কারণ যে পুরুতটিকে ডেকে নিয়ে এসেছিলাম বিয়ের রাতে, সে কোথায় বুঝি চলে গেছে, তার খোঁজ আর কিছুতে পাওয়া গেল না। আমারই ভুল, আর দু-চারটি লোককে যদি সেদিন ডাকতাম ত' তারা সেদিন সাক্ষী দিতে পারত আদালতে। হয়েছিল, আমার ঐ কুঁড়েঘরের উঠোনেই বিয়েটা হয়েছিল। তবে, দুর্ভাগ্য মেয়েটির, মহেশ সিং বাড়িতে ছিল ঐ বিয়ের রাতটাই। সেই যে ওকে পরে নিয়ে যাবে বলে গাজোল চলে গেল, আর এলো না। স্বামী থেকে স্বামী-সুখ পেলো না মেয়েটা। আফশোষের কথা।

উৎসুক কণ্ঠে বললাম—আচ্ছা, ও যে গয়না চুরি করতে পারে, এ আপনি বিশ্বাস করেন?

—কেন করব না!—নিরুত্তাপ কণ্ঠে বৃদ্ধ বললেন—পুলিস ধরেছিল হাতে-নাতে।

উত্তেজিত কণ্ঠে বললাম—ও তাহলে চোর?

—আদালত তা প্রমাণ করেছে, আমি অস্বীকার করবার কে?

মহাবীর চুপচাপ শুনে যাচ্ছিল আমাদের কথা, এই সময় হঠাৎ বলে উঠল—ছেড়ে দাও না ও-সব কথা, আর কেন? আমি ওকে ঠিক মানিয়ে নেবো, দেখো।

বৃদ্ধ মুখ ফিরিয়ে ওকে একবার দেখলেন, তারপর নিজের মনে দাড়ি নেড়ে-নেড়ে কী যেন ভাবলেন, তারপরে বললেন—আল্লা রসুল তোমাদের যেন ভালো করেন। দুর্ভাগা মেয়ে, সুখ ওর সয় না।

পুতুলের সঙ্গে কথা হলো পরদিন—ভোর বেলায়। আমাদের দুজনকে চা করে খাওয়ালে। বললে—আপত্তি নেই ত, আমার হাতে চা খেতে?

কোনো কথা না বলে আমরা দুজনেই চায়ের গেলাস মুখের কাছে নিয়ে চুমুক দিতে লাগলাম।

গজব আলি বেরিয়ে গেছেন সেই ভোরে একটা ছোট লাঠি হাতে।

বললাম—আলি সাহেব গেলেন কোথায়? ভোরে তখনো ঘুমটা ভাঙেনি, আধো জাগরণে আধো ঘুমে চোখ দুটো তখনো জড়িয়ে আছে, তারই মধ্যে দেখি, উনি একসময় উঠে পড়েছেন, দীঘির দিকে চলে গেলেন, তারপরে ফিরে এসে মাদুর গুটিয়ে নিয়ে ঘরের দিকে গেলেন, তারপরেই দেখলাম, লাঠিটা হাতে ঐ মাঠের গা ভেঙে উনি হেটে চলেছেন।

একটু অবাক হয়েই পুতুল শুনছিল আমার কথা। আমি চুপ করতেই ও বলে উঠল—আপনার চোখ ত খুব!

কিন্তু ওর কথার সূত্র ধ'রে কিছু যে বলব, সে অবকাশ আমাকে না দিয়ে ও তাড়াতাড়ি বলে উঠল—বাবার ঐ ধরণ। ভোরে উঠে ভাঙা মস্‌জিদগুলির ধার দিয়ে ঘুরে-ঘুরে বেড়িয়ে না এলে ওর মন স্থির হয় না। আমি কতো বলেছি—এভাবে বেরিও না বাবা, সাপে-খোপে কাট্‌বে। তা হেসে বলেন—নারে বেটি, ওদের হিংসা না করলে, ওরাও হিংসা করে না। ওরাও আস্তে আস্তে মানুষ চিনে ফেলে।

সে-প্রসঙ্গে যোগদান না করে উঠে এলাম ওর কুঁড়েঘরের দাওয়ায় ওর পিছনে পিছনে, মহাবীরকে মসজিদের সেই চত্বরে বসিয়ে রেখে।

দাওয়ায় মাদুর পেতে আমাকে বসতে দিয়ে, নিজে দাঁড়িয়ে রইল ঘরের কবাটটা ধরে। বললাম—কয়েকটা কাজ আছে যা আমাকে তাড়াতাড়ি করতে হবে। ভূমিকা-টুমিকা আমার করলে চলবে না। আলিসাহেবকেও বলেছি, তিনি রাজী হয়ে গেছেন। এবার তুমি রাজী হলেই হয়।

মুখ টিপে একটু হাসল, বলল—বিয়ের কথা ত? সে আমি বুঝেছি।

বললাম—ভালোই হয়েছে। এবার রায়টা শুনিয়ে দাও।

সেইভাবেই মিটিমিটি হাসতে হাসতে বললে—আচ্ছা মানুষ, থান পরে বিয়ে হয়? শাড়ি কই?

—শাড়ি? এখনি ব্যবস্থা করে দিচ্ছি।

বলে, ওর দিকে না তাকিয়ে দ্রুত চলে এলাম বেড়া-দেওয়া উঠোনের আগড় খুলে একেবারে মহাবীরের কাছে।

বললাম—এখুনি যাও চলে ইংরেজবাজার। পোস্টাপিস থেকে টাকা তুলে, শাড়ি-টাড়ি সব কিনে নিয়ে এসো।

উঠে দাঁড়ালো মহাবীর, বললে—রাজী হয়েছে?

—নিশ্চয়ই! রাজী না হয়ে যাবে কোথায়?

—তাহলে, আমি সব কেনাকাটা করে একেবারে ফিরব সেই বিকেলবেলা। কেমন?

—বেশ। আমি এদিককার ব্যবস্থায় রইলাম। বিয়েটা কাল হয়ে গেলেই ভালো হয়।

চলে গেল মহাবীর। ওকে খানিকটা এগিয়ে দিয়ে আমি ফিরে এলাম আবার ওর ঘরের দাওয়ায়। বললাম—তোমার বরকেই পাঠিয়ে দিলাম। আসছে সে শাড়ি-টাড়ি নিয়ে।

অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল আমার দিকে, আমি যে সত্যিই

এটা করে তুলতে পারি, এ-যেন সে বিশ্বাসই করতে পারছিল না এতক্ষন!

বললাম—কালই কিন্তু বিয়ে।

কণ্ঠে তার অস্ফুট একটা প্রতিধ্বনি উঠল—কালই বিয়ে!

হ্যাঁ—বললাম—সকাল-সকালই সদরে যাবো। রেজিস্ট্রার একজন নিশ্চয়ই আছেন ওখানে, তাঁকে ধ'রে একেবারে খাতায় নাম লিখিয়ে—বিয়ে।

কী যে সে দেখতে লাগল আমার মুখের দিকে অপলক দৃষ্টিতে তাকিয়ে, জানি না। এক সময়, দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে চলে গেলো ঘরের ভিতরে। টুকিটাকি কী-সব কাজ করতে লাগল।

দাওয়ার ওপর বসে আছি চুপচাপ। রৌদ্র উঠে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়লেও প্রখর হয়নি তেমন। মসজিদের পাশে একটা ঝাঁকড়া মাথা বড়ো আম গাছ ছিল, তার পাতায়-পাতায় সকাল-বেলাকার বাতাস এসে দোল দিয়ে যাচ্ছে! আকাশটা মেঘ্‌লা-মেঘ্‌লা—রোদ্দ‌ুরটা তাই একটু স্তিমিত মনে হচ্ছে।

কেমন যেন অন্য মনস্কের মতো বসে বসে আমের পাতায় পাতায় ঝিরঝিরে হাওয়ার কাঁপন দেখছি, হঠাৎ চমক ভাংল অদূরের কোনো একটা মোটর-গাড়ীর শব্দে। এ-অঞ্চলে মটোর-গাড়ী করে কে এলেন, সবিস্ময়ে মুখ বাড়িয়ে সেটা লক্ষ্য করছি, পুতুল এসে দাঁড়াল ঘর থেকে দাওয়ায়।

বললে—একটা গাড়ী এলো বলে মনে হচ্ছে।

পুতুলও যে একটু বিস্মিত হয়েছে, সে ওর মুখ দেখেই টের পাওয়া যায়। আমার প্রশ্নের উত্তরটা দিলে বেশ কিছুক্ষণ পরে।

বললে—বাবার অফিসার এসেছেন বোধ হয় কলকাতা থেকে।

—অফিসার।

—হ্যাঁ! তা আসে। তবে, খুব কমই আসে। এত বড়ো বয়সটা আমার হলো, এতো বছরে কবার অফিসার এসেছে, হাতে গুণেই বলে দিতে পারি।

কিন্তু, না, অফিসার এলেন না, এলেন একটু পরেই আলি সাহেব। আমাকে দেখে খুসীই হলেন মনে হলো। 'আদাব' জানিয়ে বললেন—রাত্রে ঘুম হলো কেমন? অসুবিধা হয়েছে নিশ্চয়।

বললাম—না-না, কিছুমাত্র না। খুব ঘুমিয়েছি।

আলিসাহেব বললেন—মহাবীরজী কোথায়? তাঁকে দেখছি না কেন?

বললাম—সদরে গেছে।

—কেন? হঠাৎ সদরে কেন?

বললাম—শাড়ি-টাড়ি আনতে গেছে। বিয়েতে লাগবে না?

আলি সাহেব বললেন—জল খাবার খেয়ে গেছে? মা, তুমি খেতে দাও নি ওদের?

চট্ করে আবার ঘরে চলে গেল পুতুল, এবং ফিরে এলো পর মুহূর্তেই। আমার সামনে এক বাটি মুড়ি ঠক্ করে নামিয়ে রেখে তাড়াতাড়ি সরে গেল।

আমি ওঁর দিকে তাকিয়ে বললাম—আপনার?

আলি সাহেব বললেন—আপনি খান। আমি সকালে কিছু খাই না। ভালো কথা, দুপুরে ভাত খাবেন ত? ভয় নেই, আপনারা যাকে অখাদ্য বলে ধরেন, আমিও তা খাই না। আর তাছাড়া, মা এসেছে, ও থাকে ওর মতো, কোনো অসুবিধা হবার কথা নয় আপনাদের।

দাওয়ারই এক প্রান্তে বসে কথা বলছিলেন আলিসাহেব। বললেন—আমি এখনই চানটা সেরে নেবো। আসবেন নাকি? দীঘির জল ভারি সুন্দর! চান করে আরাম পাবেন।

বললাম—মন্দ কী!

আলি সাহেব পুতুলকে ডাকাডাকি করে তেল-গামছা ইত্যাদি আনালেন। সে এক সময় একটু অবাক হয়েই বললে—আজ এত সকাল সকাল চানে যাচ্ছ যে বাবা?

উনি একটু হাসলেন, বললেন—আজ আমাকে একটু বেরতে হবে মা। গৌড় যাবো।

—গৌড়!

উনি বললেন—হ্যাঁ। ঐ যে বাগানের ধারে জিপ্‌গাড়ী দাঁড়িয়ে আছে?

পুতুল বললে—গাড়ীর শব্দ শুনেছিলাম। অফিসার এসেছে বুঝি?

উনি হাসলেন, বললেন—ঠিক ধরেছ। ডাক বাংলায় উঠেছেন।

বললাম—ব্যাপারটা ঠিক বোধগম্য হচ্ছে না আলিসাহেব, যদি একটু আলোকপাত করেন?

আমার দিকে ফেরালেন হাসিমুখখানি, বললেন—বলিনি বুঝি? ভুল হয়ে গেছে তা হলে। আপনি দিল্লী গেছেন কখনো? কিম্বা, আগ্রা?

বললাম—দিল্লী আর আগ্রা! কলকাতাই যাইনি কখনো!

বললেন—দিল্লীর রেডফোর্ট, যাকে বলে লাল কেল্লা, তার কথা শুনেছেন ত?

—তা' শুনেছি।

বললেন—সেই লালকিল্লায় আমরা কাজ করে আসছি ঠাকুর্দার আমল থেকে। কী কাজ, জানেন? লালকেল্লার দেয়ালে আর মেঝেতে যে সব প্রাচীন শিল্প-নিদর্শন আছে, তার কিছু ভেঙে গেলে বা নষ্ট হয়ে গেলে, আমি সে-সব ভাঙা অংশগুলি বসে বসে মেরামত করে আবার যথাস্থানে লাগিয়ে দেই। যে-গুলি নষ্ট হয়ে যায়, আমরা তার বদলে নতুন জিনিষ তৈরী করে দেই। অবশ্য সবই পাথরের কাজ। পাথরের নানান রকমের নক্সা, ফুল, লতা-পাতা। বহুৎ মেহনতের কাজ। একাজ তাজমহলেও চলে, আগ্রা-ফোর্টেও চলে, ফতেপুর সিক্রিতেও চলে, লালকিল্লাতেও চলে।

সবিস্ময়ে শুনছিলাম। উনি একটু থেমে আবার বলতে লাগলেন—ওদিকে যদি কখনো যান দেখতে পাবেন, কিল্লা বা তাজমহলের এক পাশে বসে দু-একটি লোক যন্ত্রপাতি নিয়ে পাথর ঘ'ষে ঘ'ষে কী-সব করে চলেছে দিনরাত। আমরাই ও-সব কাজ করি, আমাদের জ্ঞাতি গোষ্ঠীরাই ওকাজে মেতে থাকে। আমাদের পূর্ব-পুরুষরাই হাতে-কলমে তাজমহল, আগ্রাফোর্ট-লালকিল্লায় ঐ-সব সূক্ষ্ম শিল্পকর্ম করে গেছেন। এ-কাজে আমাদের দক্ষতা হয়েছে, যাকে বলে,—পুরুষানুক্রমে।

বলে উঠলাম—কিন্তু, এখানে এসে পড়লেন কেন?

বললেন—আব্বাজানের হাত ধরে শিশু-বয়সে এসে পড়ি এখানে। আব্বাজানকে এ-অঞ্চলে নিয়ে এসেছিলেন ইংরেজ সরকার। এখানকার মস্‌জিদে কতগুলি সূক্ষ্ম কাজ আছে, যেমন, ছোট-ছোট পাথরের ছোট-ছোট রঙীন ফুল। ঐ ফুলেরই কাজ আমরা জানি, অন্য কাজ নয়। ঐ কাজই করতেন এখানে আব্বাজান, আমিও করে চলেছি। আমার পরে কে আসবে জানি না। আসার দরকার হবে কিনা, তাও জানি না।

প্রশ্ন করলাম—এই সব কাজেই বুঝি গৌড় যাচ্ছেন ?

বললেন—হ্যাঁ। বেশীক্ষণ লাগবে না। বেলা বারোটা একটার মধ্যেই ফিরে আসবে। জিপ্‌গাড়ী হু-হু করে বেরিয়ে যাবে। আসুন চানটা সেরে নি।

গেলাম। বিস্তৃত দীঘি, একদিকে ঘাট বাঁধানো, কিন্তু পুরানো ঘাট বলে ভেঙে পড়েছে। জল পরিষ্কার, ধারে-ধারে শ্যাওলা জন্মালেও জল তেমন নোংরা করতে পারেনি।

উনি বললেন-'অজু' করবার জন্য বোধ হয় এই দীঘির সৃষ্টি হয়েছিল।

চারিদিকে তাকিয়ে তাকিয়ে দেখছিলাম। বললাম—আলি সাহেব, লোকজন বোধ হয় এদিকে কম, তাই না ?

বললেন—শহর ত নয়, পাড়াগাঁ। লোক তেমন কোথায় ? তবে আছে, গ্রামে লোক আছে বই কী ! যে-যার ধান্দায় ব্যস্ত। কেউ মাঠে নেমেছে, কেউ জন খাটতে গেছে।

স্নান-শেষ করে আমরা উঠে আসছি, উনি বললেন—আমার ঘরের ভিতরটা আপনি দেখেন নি, না ? কতো রকমের সব টুক্‌রো টুক্‌রো পাথর জড়ো করা আছে, চলুন দেখাবো।

যে-কাজটা উনি করেন, সেটা অবশ্যই ভালো বাসেন। নইলে, বাড়ীতে এসে, পাথর দেখাতে গিয়ে এমন ছেলে মানুষের মতো উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠতেন না উনি !

—মা ? মা কোথায় ?

—কী বাবা ?—বলে পুতুল এসে দাঁড়ালো দাওয়ায়।

উনি বললেন—মা, আমার হাত-বাক্সটা একটু বার করে আনো ত ?

—আনছি বাবা।

বহু পুরানো একটা নক্সা-কাটা কাঠের হাত-বাক্স, খুবই ছোট। সেটা নিয়ে এসে ঠক্ করে আমার সামনে এনে রাখল পুতুল। কিন্তু, এবার সে চলে গেল না, দেওয়ালে ঠেস্ দিয়ে দাঁড়িয়ে সব-কিছু দেখতে লাগল।

বাক্সটা নুড়ি-পাথরে ভর্তি। ধবধবে সাদা পাথরের টুকরো, নীল পাথরের টুকরো, লাল পাথর, সবুজ পাথর, বাস্তবিকই এ'রকম নুড়ি-পাথরের সমাবেশ বড়ো একটা দেখা যায় না।

বললাম—এ-সব এ-অঞ্চলে পাওয়া যায় বুঝি?

উনি বললেন—না বাবুজী, তা' নয়। এসব পাথর কলকাতার অফিস থেকে এনেছি। কাজ করবার জন্য ওরা দেয় যে! ওরাও আনিয়ে রাখে নানান দেশ থেকে! এসব পাথরের টুক্‌রো ভেঙে ঘষে ঘষে আমরা পাথরের ফুল তৈরী করি।

পুতুল এই সময় বলে উঠল—গাড়ী কতক্ষণ বসে থাকবে, বাবা? অফিসার রাগ করবে না?

আলিসাহেব তাড়াতাড়ি বাক্সটা বন্ধ করলেন। তারপরে, তাতে চাবি লাগাতে লাগাতে বললেন—অফিসার ত যাবেন না, মা। তিনি ত সেই পিয়াসবাড়ী দীঘির বাংলোতে বিশ্রাম করছেন। আমাকে বললেন—আলি, তুমি গিয়েই দেখে এসো। তুমি যা-সব মেরামতির লিষ্টি দেবে, আমি তার ওপরই অর্ডার করিয়ে দিয়ে যাব। অতদূর আর যেতে ইচ্ছা করছেনা। জিপ্ নিয়ে তুমিই চলে যাও। বলে, শিশুর সারল্যে হেসে উঠলেন আলিসাহেব, বললেন—অফিসার আমাকে বিশ্বাস করেন খুবই।

এবার বাক্সটা হাতে নিয়ে উনি উঠলেন নিজেই। নিজেই ওটা হাতে নিয়ে ঘরে গেলেন।

পুতুল নিম্নকণ্ঠে বললে—রান্নাবান্না করছি কিন্তু।

বললাম—তাই নাকি! কিন্তু, রান্নাঘর কোথায় তোমার!

চোখের সামনে, উঠোনের অপরপ্রান্তে, মেঝেতে-উনুন-খোদাইকরা একটা রান্নাঘর দেখ্‌ছি, আগড়টা খোলা থাকাতে সবই চোখে পড়ছে, কিন্তু সেখানে ত রন্ধন-উদ্যোগের কোনো চিহ্নই বিদ্যমান দেখছি না!

আমি সেদিকে উৎসুকনেত্রে তাকাচ্ছিলাম দেখে পুতুল বললে—ওটা বাবার রান্নাঘর। আমি রান্না করছি পিছনের দাওয়ায়। আর কোনো কথা না খুঁজে পেয়ে আমি চুপ করে আছি। পুতুলও দাঁড়িয়ে আছে, নীরবে। কেমন যেন একটা অস্বস্তি বোধ করছিলাম। একটা ভয়ও হতে লাগল মনে। ডাকলাম, আলি সাহেব গৌড় যাচ্ছেন, মহাবীরও ইংরেজ-বাজার গেছে, আমি একা থাকব বাড়ীতে, পুতুলের কাছে? যদি বিবাহের প্রসঙ্গে নতুন কিছু আপত্তি তুলে বসে সে? তার থেকে শাড়ী-টাড়ি আনতে মহাবীরকে যখন সে ইংরেজবাজারেই পাঠাতে পেরেছে, তখন, ওকেই তার সম্মতির লক্ষণ ধ'রে আমরা চুপচাপ থাকি না কেন? আমাকে একা পেলেই নানারকম কথা বলবে সে, শেষ পর্যন্ত যা আমরা 'হ্যাঁ' মনে করছি, সেটাই হয়ত "না" হয়ে দাঁড়াবে! তার থেকে আমিও বেরিয়ে পড়ি না কেন, আলিসাহেবের সঙ্গে?

কথাটা মনে হতেই এত উৎসাহ অনুভব করতে লাগলাম যে, বলবার নয়! উনি ঘর থেকে দাওয়ায় পা রাখা মাত্রই উঠে দাঁড়ালাম, বললাম,—আমাকে সঙ্গে নেবেন আলি সাহেব?

বিস্মিত হলেন উনি, বললেন—কোথায়?

—গৌড়?

—যাবেন!

আমি কিছু বলবার আগেই পুতুল বলে উঠল—বারে, বাবা কাজে যাচ্ছেন, সঙ্গে সঙ্গে আপনার আবার যাওয়ার দরকারটা কী পড়ল!

বললাম—আছে দরকার। যাচ্ছেন নিয়ে, আলিসাহেব? যদি আপত্তি না থাকে।

—না—না, আপত্তি কীসের!—আলিসাহেব বললেন—আমি বরং আপনাকে অনেক জিনিষ দেখাতে পারব। চলুন তবে।

মুখ ফিরিয়ে পুতুলকে বললাম—যাচ্ছি। মহাবীর এলে ওকে একটু বসতে বলো।

মুখ ভার করে পুতুল চলে গেল ভিতরের দাওয়ায়, আমরা চলে এলাম উঠোন পেরিয়ে, বাইরে।

জিপ্ গাড়ীতে ড্রাইভারটি প্রায় ঘুমিয়ে পড়েছিল। আলি সাহেব হাঁকডাক করে তাকে জাগালেন। আমি গেলাম জিপের ভিতরে, উনি বসলেন ড্রাইভারের পাশে।

এই যে যাওয়ার ব্যাপারটা ঘটে গেল আকস্মিকভাবে, এর জন্য মনে-মনে প্রস্তুত ছিলাম না বটে, কিন্তু যে-কঘণ্টা ওঁর সঙ্গে সেদিন কাটিয়েছিলাম, তাতে শুধু আনন্দই পাইনি, আজ মনে হচ্ছে, এর সেদিন খুবই দরকার ছিল। মহানন্দা নদী পর্যন্ত সমস্তটা পথ কোনো কথাই হয়নি। এবং এই নীরবতার সময়টুকু, বারবার মনে হচ্ছিল, পুতুলের কাছ থেকে দূরে সরে এসেছি বটে, কিন্তু তার স্মৃতিকে পরিহার করতে পারছি কই? একটা অস্বস্তি আর জিজ্ঞাসা ক্রমাগত লোভী ভ্রমরের মতো বারবার মনের মধ্যে গুণ্ গুণ্ করে ফিরছে। অস্বস্তি ওর কাছে নিজের উপস্থিতি নিয়ে। আর জিজ্ঞাসা, ওর জীবন নিয়ে।

মহানন্দা পার হবার পর উনি এলেন ভিতরে, আমার

কাছে। বললেন—আপনার সঙ্গে গল্প করা যাক। চুপচাপ বসে আছেন ?

—বলুন।

উনি বললেন—মেঘ্‌লা-মেঘ্‌লা দিন আছে, ঘুরতে আপনার কষ্ট হবে না।

—না কষ্ট হবে কেন ?

বললেন—পুতুল তখন ছোট, আমার সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে বেড়াতো মস্‌জিদে মস্‌জিদে। তখন ঘন ঘন এতো জীপ্‌ গাড়ী পাওয়া যেতোনা, ঘোড়ায় টানা গাড়ীতে করে ওকে নিয়ে গৌড় গেছি।

চুপ করে রইলাম। মনে হলো, পুতুল সম্বন্ধে আরও অনেক কথা ওঁকে জিজ্ঞাসা করি। কিন্তু উৎসুক হয়েও কথা বলতে পারলাম না। কীসের এক অভাবিত সংকোচ এসে আমার কণ্ঠ রোধ করল। আমার সেদিনকার সেই অবস্থার কথা ভেবে আজও অবাক হয়ে যাই !

গাড়ী ক্রমশঃ ইংরেজবাজার এসে গেল। একদিকে বাজার অন্যদিকে স্কুল, জনসমাকীর্ণ স্থান। বাইরে চোখ মেলে বারবার তাকাচ্ছি, যদি হঠাৎই দেখা হয়ে যায় মহাবীরের সঙ্গে, ত বলব,—শীগ্‌গীর ফিরে যাও পাণ্ডুয়ায়, পুতুল একা আছে।

কিন্তু কই, কোথায় মহাবীর ?

ইংরেজবাজার থেকে মাইল আষ্টেক দূরে হচ্ছে পিয়াসবাড়ী দীঘি। আমি যখন সদর থানায় ছিলাম, তখন কী-এক তদারকীর ব্যাপারে দারোগাবাবুর সঙ্গে পিয়াসবাড়ী এসেছিলাম, শুধু পিয়াসবাড়ী কেন, আরও দক্ষিণে আধ মাইলের মতো গেলে পড়ে রামকেলি গ্রাম, দারোগাবাবুর সঙ্গে সেখানেও গিয়েছিলাম। রামকেলিতে তদারকী ছিল না, পিয়াসবাড়ীতে তদারকী সেরে দারোগাবাবু রামকেলিতে

এসেছিলেন মদনমোহন ঠাকুর দর্শন করতে। সেদিনটির কথা আমার আজও মনে আছে! আম-পাকানো গরম' বলে একটা কথা আছে, সে-সময় ছিল সেই আম-পাকানো গরম! চারিদিক দিয়ে যেন আগুনের হল্‌কা বইছে! জ্যৈষ্ঠ মাসের সংক্রান্তি ছিল দিনটা! শুভ দিন, বিরাট মেলা হচ্ছিল সেদিন রামকেলিতে। দারোগা মুখার্জী সাহেব বললেন—সরকার হে, পুণ্যদিনে রাম-কেলিতে এসেছ, এসো রূপসাগর দীঘিতে স্নান করে নি। রূপসাগর দীঘির পাড় তখন লোকে লোকারণ্য, প্রচণ্ড গরম, তবু যে-যেখানে একটু গাছের ছায়া পেয়েছে, অমনি বসে পড়েছে!

মুখার্জী-সাহেব সেদিন রামকেলিতে এসে যেন শিশুর মতো হয়ে পড়েছিলেন! অমন যে রাশভারী দারোগা, কোথায় গেল তাঁর গাম্ভীর্য আর কঠোর মনোভাব! সাধারণ মানুষের সঙ্গে মিশে সেদিন রূপসাগর-দীঘিতে যে-ভাবে হৈ-হৈ করে স্নান করেছিলেন দারোগাবাবু, তা বহুদিন পর্যন্ত ও-অঞ্চলের লোকদের মনে থাকবার কথা!

স্নান সেরে উঠে, তাকে নিয়ে মদনমোহন ঠাকুর বাড়ীর দিকে যেতে যেতে মুখার্জী-সাহেব বলেছিলেন—খুব বড়ো তীর্থ হে সরকার! আরেক নাম—গুপ্ত বৃন্দাবন। ঐ যে কেলিকদম্ব বৃক্ষ দেখছ, মহাপ্রভু বৃন্দাবন যাবার পথে ঐ বৃক্ষতলেই বিশ্রাম করে-ছিলেন। জ্যৈষ্ঠ মাসের সংক্রান্তি ছিল সেইদিনটা! সেইজন্য আজও ঐদিনে এখানে মেলা বসে যায়, লোকজন আসে!

মুখার্জী-সাহেবের কথা ভাবতে-ভাবতে চলেছি, কখন যে আট মাইল পেরিয়ে, দীঘির পশ্চিম পারের ডাকবাংলাটিতে এসে গেছি খেয়াল করতে পারিনি। একটা বাঁক-নেওয়ার মতো ঘুরে জীপ

যখন হঠাৎ থেমে গেল, চমকে উঠে, তাকিয়ে দেখি, এসে পড়েছি—ডাকবাংলার সামনে।

আলিসাহেব বললেন—এখানে একটু নামেন। আমার অফিসারের সঙ্গে দেখা করে যাই।

নামলাম।

ঘরের ভিতরে, টেবিলের ওপর একরাশ খাতা-বই-পত্র ছড়িয়ে রেখে, তার মধ্যেকার একটি প্রকাণ্ড মোটা বইয়ের মধ্যে ডুবে গেছেন এক ভদ্রলোক। চল্লিশ-পঁয়তাল্লিশের বেশী হবে না বয়স, শীর্ণ চেহারা, মাথার সামনে বেশ টাক পড়ে গেছে, কপালের বলিরেখা গুলি সুস্পষ্ট। চোখে, পুরু কাঁচের চশমা। গায়ে গেঞ্জি পরণে ধুতি।

—সেলাম।

আলিসাহেবকে যেন তিনি হঠাৎ দেখতে পেলেন 'সেলাম'-এর উত্তরে মুখ তুলে। একটু যেন চ'মকেই উঠলেন, বইয়ের রাজ্য থেকে হঠাৎ একেবারে বাস্তবে। বললেন—আলি এসেছ, বোসো বোসো। সঙ্গে এটি কে ?

নমস্কার করলাম। আলি বললেন—আমার বন্ধু বলতে পারেন স্যার, আমার তরুণ বন্ধু। আমার সঙ্গে গৌড় দেখতে যাচ্ছে।

—বেশ বেশ। বোসো তোমরা।

আমরা বসলাম, পাশেই দেয়াল ঘেষে পেতে রাখা একটা বেঞ্চির ওপর।

ভদ্রলোক আমাদের বসতে বললেন, কিন্তু, তার পরে আর হুঁস নেই, বোধ হয় আবার ডুবে গেছেন তাঁর বইয়ের মধ্যে। আলিসাহেব আমাকে ফিসফিস করে বললেন—খুব পণ্ডিত লোক।

—কী নাম

আলি বললেন—ব্যানার্জী সাহেব বলে আমরা ডাকি। পুরো নাম—দয়াময় ব্যানার্জী।

তারপরে, কিছুক্ষণ আমরা বসে রইলাম চুপচাপ। আলি সাহেবের গৌড় যাওয়া, আর পিয়াসদীঘির বাংলোর সেই ব্যানার্জী-সাহেব, সব মিলিয়ে সেদিন যে একটা অনুভূতির সৃষ্টি করেছিল, আজও তা' আমি স্মরণ করতে পারি! আমি সামান্য এক গ্রাম্য-থানার গ্রাম্য কনেষ্টবল, আমার শিক্ষা আর সহবৎ কতটুকুই বা ছিল, কিন্তু, ঐ যে ক্ষ্যাপামী ছিল কবিতা-লেখা, সেই জন্যই নিজেকে একা পেলেই চিন্তা করতে আরম্ভ করতাম, যে কোনো সূত্র ধ'রে চিন্তা, যে-কোনো সামান্য ঘটনাকে কেন্দ্র করে কল্পনার তন্তুজাল-রচনা!

সেদিন সেই পিয়াসদীঘির বাংলো-ঘরে চুপচাপ বসে থাকতে থাকতে হঠাৎ মনে হলো, ঐ যে বইয়ের-ওপর মুখ-গুঁজে-থাকা মূর্তিটি দেখতে পাচ্ছি, আর ওই যে পাশে বসে আছেন শুভ্রকেশ-শুভ্র শ্মশ্রু প্রশান্ত বৃদ্ধ ব্যক্তি,—এঁরা বুঝি কেউই বর্তমানকালের মানুষ নন, ইতিহাসের পৃষ্ঠা থেকে হঠাৎ উঠে এসে আমার সম্মুখীন হয়েছেন!

চিন্তাটা এমন করে আমাকে সেদিন পেয়ে বসেছিল, যে, আমি এক অদ্ভুত অসাচ্ছন্দ্য অনুভব করতে আরম্ভ করেছিলাম! মনে হচ্ছিল, ছুটে বেরিয়ে পড়ি ঘর থেকে! বেরিয়ে, জীপে উঠে বসি, বসে ড্রাইভারকে বলি, এখখুনি ফিরে চলো পাণ্ডুয়া, ফিরে চলো সেই অদ্ভুত বন্দিনীর কাছে, যার নাম, পুতুল!

কিন্তু, না, পরক্ষণেই সম্বিত ফিরে এলো। 'পুতুল' নামটা যেন চেতনার দরজায় এসে প্রবল এক নাড়া দিলো। সেই নাড়া

পেয়ে ঝিমিয়ে পড়া মানুষ জেগে ওঠে সমস্ত অবসন্নতা থেকে! মনে হলো, পুতুলের কাছ থেকে আপাততঃ দূরে থাকাই আমার কর্তব্য। আমি কাছে থাকলে ওর পক্ষে কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছতে দ্বিধা হতে পারে!

এখন বেলা হলো কতো? মহাবীর কি এখনো ফিরে আসেনি? মহাবীর নিজে ওর সঙ্গে কথা বলুক এই অবসরে। বলুক, আমার এমনই ভাগ্য, এমনই আমার পরিবেশ, তুমি ছাড়া আমার আর বিয়ে করার মতো মেয়েই জুটবে না! তুমি বিয়ে করো আমাকে, আমি সংসার পাতি। ছন্নছাড়া হয়ে ঘুরে বেড়াতে কার সাধ যায়?

—"বিয়ে করার মতো মেয়ে জুটবে না কেন?—যদি প্রশ্ন করে পুতুল? মহাবীর পরিস্কার করে ওকে বুঝিয়ে বলতে পাববে ত? বলতে পারবে ত, আমাকে যা সে বলেছিল, এবং যে-ভাবে বলে-ছিল? পুতুলের নিজের জীবন কলঙ্কিত, আরেকজনের জীবনে কোনো কলঙ্কিত রেখার আভাষ পেলে তার মনে সমবেদনা আর সহানুভূতি জাগাই ত স্বাভাবিক! ও-প্রশ্নের উত্তরে মহাবীর যেন সব কথা খুলে বলতে দ্বিধা না করে! যেন খুলে সে বলে—আমি ক্ষত্রিয়-বংশে জন্মেছি বটে, কিন্তু আমাদের গ্রামের সমাজে আমরা জাতিচ্যুত! পাববে কি একথা বলতে, মহাবীর? পারবে কি বলতে,—পুতুল, আমি আমার বাবার রক্ষিতার ছেলে, সেইজন্য আমাদের জাত থেকে—আমাদের সমাজ থেকে মেয়ে পাওয়া আমার পক্ষে কখনই সম্ভবপর নয়!

—স্যর?

আলিসাহেবের কণ্ঠস্বর। মুহূর্তে আবার ফিরে এলাম বাস্তবে। সেই পিয়াসবাড়ীর ডাকবাংলো, সেই অফিসার, আর সেই আলি সাহেব!

—স্যর ?

যেন এতক্ষণে চমক ভাঙল ব্যানার্জী-সাহেবের। চমক ভেঙে বলে উঠলেন—উ ?

—এবার রওনা হই ?

—ও-হ্যাঁ,—ব্যানার্জী-সাহেব সোজা হয়ে বসলেন, বললেন—আরে, সেই থেকে বসে আছো আলি ? ছি-ছি, আমারই ভুল ! যাও-যাও—এখুনি রওনা হয়ে যাও। আজ আর নয়, একেবারে কাল এসে দেখা কোরো।

আর হ্যাঁ, শোনো ? তাঁতিপাড়া মসজিদটা ভালো করে একবার দেখো, বুঝলে ? ওর নক্সাগুলো—

আলিসাহেব বললেন—আজ্ঞে হ্যাঁ, তাঁতিপাড়ারই নক্সা ক্ষয়ে গেছে সব থেকে বেশী।

ব্যানার্জী বললেন—ক্ষয়ে যাবে না ! ওটা আজকের ? ১৪৮০ খৃষ্টাব্দে মীরসাদ খাঁ এটি তৈরী করেন। এই যে, বইতে লিখছে, দশটি গম্বুজ ছিল এর, কিন্তু সবগুলিই পড়ে গেছে ! পাঁচিলের গায়ে লতাপাতার নক্সাগুলো ভারী সুন্দর না ?

—আজ্ঞে হ্যাঁ, স্যর।

ব্যানার্জী বললেন—আরো একটি জিনিষ ভালো করে দেখে এসো। লোট্টন মসজিদটা। কেমন ? ১৪৭৫ সালে এটি তৈরী হয়েছিল। সুলতান ইউসুফ সাহ এর নির্মাতা বটে, কিন্তু তার মূলে ছিল কে, জানো ? সুলতানের এক রক্ষিতা এটা তৈরী করেন। আচ্ছা, বলতে পারো, লোট্টন কি সেই রক্ষিতার নাম ছিল ? রক্ষিতার একটি ছেলে ছিল, ছেলের কল্যাণেই সে এই মসজিদটি করে দেয়, তবে কি ছেলেটির নাম ছিল—লোট্টন ?

আলিসাহেব আর আমি, দুজনেই ওর মুখের দিকে অবাক হয়ে তাকিয়ে ছিলাম কিছুক্ষণ।

আলিসাহেব বললেন—জানি না স্যর।

—কে জানে?—ব্যানার্জী সাহেব চোখ থেকে চশমা নামালেন—এমন কাউকে পাচ্ছি না, যেসব গল্পটা বলতে পারে। বইতে ত লিখে দিয়েছি, 'এক রাজগণিকা দ্বারা মসজিদটি নির্মিত',—কিন্তু সেকুটু লিখলেই কি সব বলা হলো? আমাকে আরও সব খুঁজে বার করতে হবে। আচ্ছা, এসো?

নমস্কার জানিয়ে আমরা বেরিয়ে এলাম। জীপে বসে-বসেও চিন্তা করছি, আর মুখস্থ করছি সাল দুটো। তাঁতিপাড়া—১৪৮০, লোট্টন—১৪৭৫। লোট্টন সেই রক্ষিতার নাম, না, রক্ষিতার ছোলটির নাম?

সব যেন ওলোটপালট হয়ে গেল মুহূর্তে। পুতুল আর মহাবীর, এদের কথা ভাবতে-ভাবতে হঠাৎ এসে গেল তাঁতিপাড়া আর লোট্টন। কতো কী জিজ্ঞাসা করার ছিলো আলিসাহেবকে, কিছুই হলো না, গৌড়ে পৌঁছে যেন আরও সব ভুলে গেলাম। এযেন অজস্র ইতিহাসের ছবির মধ্যে রক্তমাংসের দেহ নিয়ে হঠাৎ প্রবেশ করেছি!

বিশাল খিলেনযুক্ত একটা ভাঙ্গা প্রবেশ-পথের সামনে এসে দাঁড়ালাম। আলিসাহেব বললেন—এর নাম—কোতওয়ালী দরজা।

কতো-কীই না দেখলাম! মানুষ নেই জন নেই—ইতিহাস স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে আছে শুধু। লুকোচুরি দরওয়াজা দেখলাম, সোনালী দরওয়াজা দেখলাম, গুমটি দরওয়াজা দেখলাম, ফিরোজ মিনার দেখলাম। দেখলাম, কদমরসুল মসজিদ, ফতে খাঁর সমাধি,

চিকা মসজিদ, বামকাঠি মসজিদ। আর তারপরে, তাঁতিপাড়া আর লোট্টন।

তাঁতিপাড়ার প্রাচীরে সত্যিই দেখা যায় অপূর্ব লতাপাতার কাজ। দু-একটি টুক্‌রো পাথর একটা ছোট্ট লোহার ছেনী দিয়ে খসিয়ে আনলেন আলিসাহেব, যত্ন করে রাখলেন রুমালে, বললেন —ব্যানার্জী সাহেবকে দেখাতে হবে। এই সব ফুল লতাপাতা যেমন ছিল, তেমনিটি করে দিতে হবে। এইসব মসজিদ, দরওয়াজা আর সমাধির অনেক পদ্মফুলের পাঁপড়ি আর লতাপাতা আমার করা, তা জানেন? কেমন, পুরোনোর সঙ্গে মিলিয়ে দিয়েছি! চলুন, এবার লোট্টনে যাই।

গেলাম। অবাক হলাম লোট্টন মসজিদের সৌন্দর্য দেখে। ওপরটা একটা গম্বুজের মতো, আর ঘরখানা চারকোঠা-ঘর, দেয়ালে সুন্দর-সুন্দর কাজ করা। আলিসাহেব বললেন—এর দেয়ালগুলো সব রঙীন ইট দিয়ে ঢাকা ছিল জানেন, এই পাঁচশো বছর ধরে লোকে এসেছে আর গেছে, আর ঐসব ইট খসিয়ে নিয়ে চলে গেছে। কিছু কিছু ইট মিউজিয়ামে নিয়ে গেছে।

অবাক হয়ে ওঁর কথাগুলি শুনছি। উনি একটু হেসে বললেন—ছোট বেলায় পুতুল এখানে কতো এসেছে আমার সঙ্গে! সত্যি কথা বলতে কী, ঐ যে তাঁতিপাড়া দেখালাম, ওর কিছু কিছু ফুল পুতুলের নিজের হতে করা।

সবিস্ময়ে বলে উঠলাম—ও জানে এ'কাজ?

—অল্প অল্প জানে। শিখেছিল আমার কাছ থেকে!

বললাম—ছোট বেলা থেকেই পুতুল আপনাকে জানে?

বললেন—জানে বই কী। খুব ছোট বেলা নয়, তবে তাকেও ছোট বেলা বলে। ওকে হঠাৎ পেলাম। কিন্তু যাক সে সব কথা।

লোট্টন মসজিদের কথা শুনলেন ত? সুলতানের রক্ষিতা, ছেলের কল্যাণে মসজিদ বানিয়ে দিয়ে ছিলেন। ছেলেকে কতটা ভাল বাসতেন, মা, তাই না? কিন্তু দেখুন, তারপরে সেই মা চলে যাবে, বাপও হারিয়ে যাবে, সমাজের নিন্দা আর কলঙ্ক মাথায় নিয়ে তুনিয়ার বুকে সেই ছেলে ঘুরে বেড়াবে একা একা, কেউ তাকে বুঝতে চাইবে না!

তখন চুপ করে রইলাম বটে, কিন্তু জীপে করে ফিরে আসতে আসতে তুললাম আবার কথাটা। বললাম—একটা কথা বলব, আলি সাহেব?

—বলুন।

বললাম—মহাবীরকে দেখলেন ত? তারও জীবনে একটা কলঙ্ক আছে। সত্যি কথা বলতে কী, সে-ও এক রক্ষিতার ছেলে! এবং সেই জন্যই গ্রাম ছাড়া সে, জাত-ছাড়াও বলতে পারেন।

একটু বিস্মিত হয়েই আমার দিকে ফিরে তাকালেন আলি-সাহেব, বললেন—তাই নাকি!

—হ্যাঁ।

—আফশোষের কথা।

বললাম—এই আফশোষ থেকে ওকে আমরা বাঁচাতে পারি, আলিসাহেব।

—কী রকম?

বললাম—পুতুলের সঙ্গে ওর বিয়েটা দিয়ে।

—বেশ ত।

বললাম—কিন্তু, পুতুল যদি শেষ পর্যন্ত রাজী না হয়?

হাসলেন একটু, বললেন—আমার কিছু করার নেই।

একবার ওর বিয়ে দিয়েছিলাম আমি। কিন্তু, তার যে বিষময় ফল হ'ল, সেটা দেখে মরমে মরে গেছি! এখন যা করেন, খোদাতালা। তাঁর মর্জিতেই সব হবে।

একটু থেমে থেকে বললাম—মহাবীর বোধ হয় এতক্ষণে সদর থেকে ফিরে এসেছে শাড়ীটাড়ি নিয়ে। আমরা নেই, ওরা দু'জনে নিজেদের কথা বলাবলি করে নিক, এইটাই চেয়েছিলাম। কিন্তু ভয় হচ্ছে, যদি পুতুল আবার বলে ওঠে—না! আবার একটু হাসলেন আলিসাহেব, বললেন—'না' যদি বলে, 'না—ই হবে, আপনি আর কি করবেন?

বুকের ভিতরটা যেন ধড়াস করে উঠল, হঠাৎ একটা আতঙ্কও জেগে উঠল মনে! আর্ত কণ্ঠেই বলে উঠলাম—না-না, তা হয় না! এ-বিয়েতে ওকে রাজী হতেই হবে।

আর কোনো কথা বললেন না আলিসাহেব, চুপচাপ বসে রইলাম গম্ভীর হয়ে। বেলা তখন একটার কম নয়! সূর্য মাথার ওপর থেকে পশ্চিমে হেলে পড়েছে!

নীরবতা ভঙ্গ করে আমিই বলে উঠলাম এক সময়। বললাম —আচ্ছা আলিসাহেব, ছোট বেলায় ও কেমন করে এসে পড়ল আপনার কাছে?

তেমনি অল্প একটু হাসলেন আলিসাহেব, বললেন—সে অনেক কথা। যদি আপনার কাছে বলবার মতো মনে হয়, ত একদিন আপনাকে বলবে। আমাকে আর সে-সব কথা মনে করিয়ে দেবেন না আপনি, সে-কথা মনে পড়লে আজও বড়ো কষ্ট হয় মনে।

তাড়াতাড়ি বলে উঠলাম—না-না, আপনার কষ্ট হয় ত থাক্।

উনি আবার চুপ করে গেলেন। আর কোনো কথা হ'ল

না। ফেরার পথে আমরা আর পিয়াসবাড়ীর ডাকবাংলোয় গেলাম না, সোজা চলে এলাম ইংরেজবাজার। আবার সেই মহানন্দা পেরিয়ে যাওয়া, আবার সেই ছায়াঢাকা পাণ্ডুয়ার পথ!

এগিয়ে আসবার পর আমার চিন্তার স্রোতটাও ধীরে ধীরে পরিবর্তিত হয়ে গেল। আলিসাহেবের মুখের দিকে তাকালাম। একটা করুণ বিষণ্ণতা ফুটে আছে সে-মুখে। বড়ো মায়া হ'ল। মনে হ'ল, এই বৃদ্ধের কথা ত তেমন করে ভেবে দেখি নি! যেটুকু সঙ্গ পেলাম ও'র তাতে বুঝেছি, নির্লোভ, সদানন্দময় পুরুষ উনি! চরম দারিদ্র্যের মধ্যেও প্রসন্ন ভঙ্গীতে জীবনের পথ হেঁটে চলেছেন, কোনো নালিশ নেই! যে-কাজ উনি করেন, তাতে কতো আর পয়সা পান?

ঘুরিয়ে-ফিরিয়ে সে কথাটাও জিজ্ঞাসা করেছিলাম। একটী বৃত্তি উনি পান, সামান্যই সে টাকা। আর ঐ পাথর ঘষে ঘষে নতুন ফুল-লতা-পাতা তৈরী করার সময়, সামান্য যা-কিছু আসে! বৃদ্ধ তাতেই খুসী। উপার্জনের অঙ্কের কথাটা উল্লেখ করতে পর্যন্ত লজ্জা হচ্ছে, কারণ, এই যে দুটি বেলা ওঁর আতিথ্য গ্রহণ করলাম এসে, এতেই আমাদের সংকুচিত বোধ করতে হচ্ছে, এতো অকিঞ্চিৎকর সেই অর্থ!

যাই হোক, ফিরে ত এলাম বাড়ী। আলিসাহেব বললেন—রান্না কতদূর, মা?

—হয়ে গেছে।

—খুব ভালো।

বললাম—মহাবীর কোথায়?

পুতুল ভ্রূ-কুঞ্চিত করে আমার দিকে তাকালো। তারপরে বললে—জানি না ত!

—আসেনি ফিরে ?

—না।

চলে গেলো ভিতরের দাওয়ায়। বৃদ্ধ তাঁর ঘর থেকে তাঁর সেই বাক্সটা বার করলেন। এক হাতে মাদুর, অন্য হাতে বাক্স, বৃদ্ধ বললেন—আমি মস্‌জিদে গিয়ে বসছি। ওখানে ঠাণ্ডা আছে।

—খাবে না ?

বললেন—মহাবীরজী আসুক ?

বলে উঠলাম—তার আসতে দেরীই হবে'বোধ হয়। আসুন, আমরা খেয়েনি।

পুতুলও বললে—হ্যাঁ, বাবা তাই হোক।

বৃদ্ধ দাওয়ায় বাক্সটা নামিয়ে রেখে, আবার নিজের ঘরে ঢুকলেন। ঢুকে, একটা কলাই-করা থালা আর গেলাস নিয়ে এলেন, বসলেন গিয়ে উঠোন পেরিয়ে তাঁর নিজের রান্নাঘরে। সবিস্ময়ে বললাম—ও কী করছেন !

উনি আবার একটু হাসলেন—আমি ত এখানে বসেই খাই। আপনি দাওয়ায় বসুন।

পুতুল এ ব্যবস্থায় কোন আপত্তি করল না। অতএব তা-ই হল। আর কিছুক্ষণের মধ্যেই চুকে গেলো খাওয়া-দাওয়ার পালা। মহাবীরের তখনো ফেরার নাম নেই।

একটু পরেই, মাদুর আর বাক্স নিয়ে আলিসাহেব চলে গেলেন মসজিদে। আমি বসলাম আরেকটা মাদুরে—একটি হাতপাখা হাতে নিয়ে ওদের ঘরের দাওয়ার ওপর। হাতের কাজকর্মের মধ্যে ফাঁক খুঁজে একসময় পুতুল এসে দাঁড়ালো কাছে, ঘরের কবাট-টাকে আশ্রয় করে। আমি বললাম—খেয়ে নিলে না ?

—সে হবে'খন।

একটু হেসে বললাম—হচ্ছে ত রেজিষ্টারী বিয়ে, এতে খেয়ে নিতে দোষ কী ?

পরিহাসটা সে গায়েও মাখলে না, গম্ভীর কণ্ঠে বলে উঠল—আচ্ছা, এসব ছেলেমানুষী কি না করলেই চলত না ?

ধীরকণ্ঠে বোঝাবার ভঙ্গিতে বললাম—ছেলেমানুষী বলছ কেন ওকে ? কী করবে তুমি এখানে ? আলিসাহেবের কাছে থাকা মানে যে ওকে বিব্রত করা, এটা বুঝছ না কেন ?

চোখ দুটো ছলছল করে এলো এবার—খুবই বুঝছি। কিন্তু কী করব আমি ? কোথায় যাবো ? বাপের বাড়ির দরজাটুকুও আমার কাছে বন্ধ।

—তবে ?—বললাম—মহাবীর রাজী। কিন্তু, ওকে তুমি বিয়ে করবে না বলেছিলে কেন ?

উত্তর না দিয়ে চট্ করে সরে গেল ভিতরে। তারপরে আবার যখন এলো তখন অনেকখানি সময় পার হয়ে গেছে। তখনো মহাবীর আসেনি ফিরে। মুখ ফিরিয়ে ওর চোখের দিকে তাকালাম। বুঝতে কষ্ট হলো না, এতক্ষণ ও কাঁদছিল লুকিয়ে-লুকিয়ে।

তারপরে ও' করলকী দু-পা এগিয়ে এসে বসল এবার মাদুরের ওপর হাঁটু মুড়ে।

দেখতে-দেখতে মুখখানিতে ফুটে উঠল একটা দৃঢ় ভাব, চোখদুটি যেন জ্বলেও উঠল মুহূর্তের জন্য, তারপরে বললে—বেশ। যা খুশি করো তুমি, একটি কথাও আমি বলব না।

অতি অতর্কিত এই 'তুমি' সম্বোধন। একটু চমকেই তাকালাম ওর দিকে, বুকের ভিতরটা নিজের অজ্ঞাতেই বুঝি একটি বারের জন্য মোচড় দিয়ে উঠল। কিন্তু এ দুর্বলতা আমাকে জয় করতেই হবে।

কিছু বলতেই বোধহয় যাচ্ছিলাম, কিন্তু ওর সেই দৃঢ় অথচ কান্নাভরা কণ্ঠস্বর আমাকে স্তব্ধ করে দিলো।

ও বললে—এভাবে আমার বিয়ে দিচ্ছ কেন তুমি? বুঝতে পারো না, তোমার হুকুম অমান্য করার শক্তি আমার নেই!

কথাটা বলছিল ও অন্যদিকে তাকিয়ে। আমিও যে ওর মুখের দিকে চোখ তুলব, এ-সাহস সেই মুহূর্তে আমার আর রইল না। ধীরে ধীরে, কতকটা আত্মগতভাবেই বললাম—তোমায় বিয়ে না দিয়ে আমার কিছু করার উপায় নেই। জানো ত, আমি বাগ্‌দত্ত? অতিকষ্টে সে কাজটা ঠেকিয়ে রেখেছি। আর বোধহয় পারব না।

বিদ্যুৎবেগে ফেরালো আমার দিকে মুখ, দুটি চোখে আগুন ঝরে পড়ছে, থরথর করে কাঁপছেও বুঝি ঠোঁট দুটি।

কিন্তু মুহূর্তমাত্র। তারপরেই মুখ নীচু করে সামলে নিলে নিজেকে। শান্তকণ্ঠে বললে—সে কাজটাই আগে করা ভালো হ'ত না? বউ দেখতাম।

—বউ পরেও দেখতে পাবে!

—কেমন বউ?

—সুন্দরী।

নত মুখেই মাটির ওপর বসে আঙুল দিয়ে আঁচড় কাটতে লাগল পুতুল, আর একটি কথাও বলল না। কী একটা কাজের অছিলা করে আমিও উঠে এলাম ওর কাছ থেকে। মসজিদের কাছে এসে জোরে জোরে নিশ্বাস নিলাম বারকতক। দূরে কোথাও বুঝি বৃষ্টি হচ্ছে, বাতাস তাই ভিজে-ভিজে, ঠাণ্ডা।

তারপর, দুপুর যখন গড়িয়ে গেল বিকেলে, তখন, ফিরে এলো মহাবীর। দেখলাম, রীতিমত গৃহস্থই সে। শাড়ী জামাকাপড়,

সিঁদুর, লোহা, শাঁখা, কাঁচের চুড়ি থেকে শুরু করে বহু টুকিটাকি জিনিষ সে নিয়ে এসেছে। সেগুলি বয়ে নিয়ে এসে দিলাম পুতুলের হাতে তুলে।

বললাম—থান ছাড়ো ত এবার, শাড়ী পরো একটা, দুচোখ ভরে দেখি।

এক মুহূর্ত থমকে দাঁড়ালো, নীচের ঠোঁটটা একবার চেপে ধরলো দাঁত দিয়ে, তারপরে একসময়, ধারালো, দৃঢ় কণ্ঠে বলে উঠল—পরব আমি শাড়ী! সংসারও করব। দেখি, কে কী করতে পারে!

একটু অপ্রতিভ হ'ল বুঝি, মনে হ'ল। তারপরে, সামলে নিয়ে শান্ত কণ্ঠে বললে—না, কে কী করতে পারে? আমি ত সমাজের বার। কিন্তু শোনো" সদরে যাবো না। এখানেই বিয়ে হবে। বাবার এখানে। বাবাকে বলো, উনি সেবার যেমন করেছিলেন, এবারও সব ব্যবস্থা-ট্যবস্থা করে দেবেন।

তা-ই হ'ল। পরদিন সন্ধ্যায়, আলিসাহেব কোথা থেকে ডেকে নিয়ে এলেন একজন পুরুত ও কিছু লোকজন।

হয়ে গেল বিয়ে। কী-সব মন্ত্রপাঠ হ'ল জানি না, টোপর বা সিঁথিমৌর ছিল না, ঘণ্টাখানেকের মধ্যেই বিয়ে শেষ।

বর আর বধূকে ঘরে ঢুকিয়ে দিয়ে যখন বাইরে এসে দাঁড়ালাম, তখন চারিদিক নিঝুম হয়ে গেছে, লোকজনও চলে গেছে খাওয়া দাওয়া করে। শুধু বুড়ো পাম্প-লাইটটা জ্বলছে উঠোনের মধ্যে জ্বলজ্বল করে।

দাওয়ার একধারে আমার বিছানা পাতা, আলিসাহেব গিয়ে শুয়েছেন সেই মসজিদের চত্বরে।

আলো নিভিয়ে দিয়ে শুয়ে পড়লাম আর কোনরকম প্রতিবাদ

না করে। এসব শোয়ার ব্যবস্থা যে কার করা, তা কি আমার বুঝতে বাকী আছে? কী তিথি ছিল মনে নেই, চাঁদ উঠেছে আকাশে দেরী করে, লঘু মেঘ ভেসে ভেসে যাচ্ছে চাঁদের ওপর দিয়ে।

হঠাৎ মনে হ'ল, যদি ঝমঝম করে বৃষ্টি নেমে পড়ে? পরক্ষণেই তাকিয়ে দেখি, ঘরের এদিককার দরজাটা খোলা, ওদিককার দরজা বন্ধ। তবে কি দুটি ঘর? এতক্ষণ টের পাইনি। কথাটা চিন্তা করতেই হাসি পেলো, ঘরে প্রবেশ করলামই বা কখন, বাইরে বাইরেই ত আছি সারাক্ষণ। তবুও নিশ্চিন্ত হবার জন্য খোলা দরজাটা দিয়ে ভিতরে উঁকি দিলাম একবার। হ্যারিকেনটা কমানো, টিমটিম করে জ্বলছে। দেখলাম, আমার অনুমান ঠিক, দুটি ঘর। ভিতরে যেতেই পাশের ঘর থেকে গুনগুন করে কথা বলার শব্দ শুনতে পেলাম।

বুকটা হঠাৎ যেন আবার একবার কেঁপে উঠল, তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলাম বাইরে, দাওয়ার ওপর বিছানায়। বেশ গুমোট, একটা হাতপাখা হলে ভালো হতো।

শুয়ে শুয়ে কত কি ভাবতে ভাবতে কখন যে ঘুমিয়ে গেছি বলতে পারি না, হঠাৎ ঘুম ভেঙে গেল পায়ের ওপর কী একটা স্পর্শ অনুভব করে। প্রথমে মনে হলো, পায়ের ওপর দিয়ে নরম আর ঠাণ্ডা কী যেন একটা যাওয়া-আসা করছে! সাপ নয়ত! আতঙ্কে ধড়মড় ক'রে উঠে বসতে গিয়েই দেখি আশ্চর্য কাণ্ড! পায়ের কাছে বসে আছে পুতুল।

ঠাণ্ডা হাওয়া দিচ্ছে ঝিরঝির করে। অন্ধকার যেন একটু স্বচ্ছ হয়ে এসেছে, মনে হচ্ছে। আকাশের কোণে একটা তারা জ্বলছে যেন অস্বাভাবিক দীপ্তিমান হয়ে।

উঠে দাঁড়ালো পুতুল। ফিস ফিসিয়ে বললে—এসো আমার সঙ্গে।

যন্ত্রচালিতের মতো উঠে দাঁড়ালাম, বললাম—মহাবীর ?

—ঘুমুচ্ছে অকাতরে।

ধীরে ধীরে এগিয়ে চলল। বলল—এসো ভয় নেই।

মসজিদের যে-চত্বরে শুয়েছিলেন আলিসাহেব, সেদিকে না গিয়ে একটু ঘুরে অন্যদিকের একটা চত্বরের কাছে এসে থামল পুতুল! ওদিকের রেলিং সব ভেঙে গেছে, কিন্তু এদিকের রেলিং কিছু আছে অবশিষ্ট।

তখনো তেমন আলো ফুটে ওঠেনি, পাখীরাও শুরু করেনি তাদের কলরব, দূরে কোথায় যেন একটা মুরগী ডাকছে শুধু। ও বললে—আমার হাত ধরো, নইলে যেখানে যাচ্ছি, যেতে পারবে না। ওখানটা অন্ধকার।

বলতে গেলাম—হাত না ধরেই যেতে পারব, বলো না, কোথায় যেতে হবে ?

কিন্তু মুখে ফুটে উঠল না মনের কথা, হাত বাড়িয়ে ওর নরম হাতের মুঠিটাই ধরলাম আশ্রয় করে। ও আমার স্পর্শে একবার থমকে থেমে আমার দিকে ফিরে তাকালো, তারপরে ধরা হাতটায় একটু টান দিয়ে বললে—এসো, ঐ দেওয়ালের দিকটায়। চারিদিক ফরসা হয়ে উঠলেও কেউ দেখতে পাবে না। বড়ো নির্জন এদিকটা।

বলেই বোধ হয় একটু হাসল, বললে—আর দেখলেই বা কী হবে ?

জায়গাটা সত্যিই অন্ধকার। ওখানে পা দিয়ে, হাত ছেড়ে

দিলে আমার ; দিয়ে, দুটি হাতে আস্তে আস্তে তালি দিতে লাগল আশ্চর্য হয়েই বললাম—কী ব্যাপার !

ও বললে—সাপ থাকে অনেক সময়। হাওয়া খায়। যদি থাকে ত, শব্দ শুনলেই পালিয়ে যাবে।

সহজ ভাবেই বলছে কথাটা, কিন্তু আমার মেরুদণ্ড দিয়ে যেন একটা হিমস্রোত বয়ে গেল।

ও আবার ধরলো আমার হাত। ধরে এগিয়ে দিলো আরও কয়েক পা।

তারপরে রেলিং-এ ঝুঁকে, রেলিং-এ ভর দিয়ে দাঁড়িয়ে রইলো চুপচাপ।

অসহিষ্ণু কণ্ঠে বললাম—কী বলবে বলো ! মহাবীর উঠে তোমায় না দেখতে পেলে কী ভাববে ?

একটু বোধ হয় হাসল—ভাববার সময় নেই। এইত ঘুমুলো একটু আগে।

যা বুঝলাম, ঘুম ভাঙতে সেই সাতটা-আটটার কম নয়।

—গল্প করলে বুঝি সারারাত ?

বললে—হ্যাঁ। বললাম আমার ইতিহাস ! আমি মুসলমানে ধরে-নিয়ে-যাওয়া মেয়ে, তারপরে একজনের রক্ষিতা, চুরির অভ্যাস আছে, একবার আম চুরি করে ধরা পড়েছিলাম, এই সবই বললাম আর কী। ওর জানা থাকা ভালো, বুঝলে না ?

একটুক্ষণ থেমে থেকে তারপরে বললাম—একরাশ মিথ্যে কথা বলেছ ওকে !

বলবে কি আমাকে দয়া করে সত্যি কথাটা ? হঠাৎ চাপাকণ্ঠে কেঁদে উঠল, তারপর কান্নাভরা কণ্ঠেই বলতে লাগল—একমাত্র তুমি। তোমার কাছেই বলতে পারি আমার সত্যি কথাটা। গত

চার মাস, দিন নেই, রাত নেই, সব সময় ভেবেছি তোমার কথা। ভেবেছি, এ কী অদ্ভুত মানুষ! একে পুলিশের বেশে সাজালো কে?

বললাম—তার আগে বলো ত, এত ভাল কথা বলা তুমি শিখলে কোথায়?

কতদূর লেখাপড়া শিখেছ তুমি? আমার হাতখানা টেনে নিলে, রাখলে রেলিং-এ, তারপরে মাথাটা কাত করল সেই আমার হাতটির ওপরে। বললে—কেন এভাবে আমার বিয়ে দিলে তুমি? সত্যি করে বলো ত?

উত্তর দিতে পারলাম না। ও কিছুক্ষণ প্রত্যাশায় থেকে তারপরে বললে—থাক, শুনতে চাই না। আমার বিয়ে দিয়ে তুমি সুখী হয়েছ ত?

বললাম—কিন্তু, আমার কথার উত্তর এখনো পাইনি।

—কী কথা?

—কতদূর লেখাপড়া শিখেছ তুমি?

—সামান্য। এই বাবার কাছে।

এঁকে পেলে কোথায়?

—পেলাম। লোকে বলবে—মুসলমান ধরে নিয়ে গেছে। বাবাকে ত আর ওরা জানে না।

একটুক্ষণ থেমে থেকে আবার বলতে লাগল—বাড়িতে আমার সৎ-মা। জানো ত? মা মারা যাবার পর, আবার বিয়ে করেছিল বাবা। বিয়ে করে কিছু সম্পত্তিও পেয়েছিল। আমি তখন ছোট্ট, এগারো-বারো বছর বয়স। দেখতে গোলগাল ছিলাম। নতুন মা ছিল রোগা-ছিপ্‌ছিপে। সেইজন্যই বোধ হয় আমার ওপর পড়ল বিষ নজর। এটা-ওটা শত কাজ করাতো দিন-রাতে, পান থেকে চুণ খসলে—বেদম মার! বাবা দেখেও দেখত না,

দু'একসময় থাকতে না পেরে কথা বলতে আসত বটে, কিন্তু মার ধমক খেয়ে অমনি চুপ করে যেতো। রাগ হ'ত বাবার ওপরে, অভিমান হতো, কিন্তু আজ বুঝি, বাবার কিছু করার ছিল না। খুবই গরীব, জন খেটে-খেটে বাড়তি পরিশ্রমে হাঁপানীর রোগ হয়ে দাঁড়িয়েছিল। বাবার নতুন মায়ের সঙ্গে বিয়ে হয়ে কিছু সুরাহা হয়েছিল সংসারের। মেয়ের পক্ষ নিয়ে মাকে চটালে আবার দারিদ্র্য চেপে বসবে দৈত্যের মতো। তাই, লাঞ্ছনা আমার ছিল দৈনন্দিন প্রাপ্য। বড়দি ছেলেপিলে নিয়ে বিধবা হয়ে এসে উঠল বাপের বাড়িতে। বিধবা বিয়ে আমাদের সমাজে খুবই হয়, কিন্তু অতোগুলি ছেলেপিলে শুদ্ধু বিধবাকে বিয়ে করবে কে? সে বড়দিও আমাকে রক্ষা করতে পারত না নতুন মার অত্যাচার থেকে। নতুন মার মন রেখে যে তাকেও চলতে হয়। বলব কী, সংসার যে কী বিভীষিকার ক্ষেত্র, সেই বয়সেই আমি তা হাড়ে-হাড়ে বুঝেছিলাম। দিন রাত্রে ঝিয়ের মতো খাটি, তার ওপরে উঠতে বসতে মার। মেয়েমানুষ যে মেয়েমানুষকে অমন ভীষণভাবে মারতে পারে, সে কেউ না দেখলে ধারণাও করতে পারবে না। রাত্রে গায়ের ব্যথায় ঘুম হ'ত না, মরা মায়ের মুখখানা মনে করে আকুল হয়ে কাঁদতাম! বড়দি বলতো—চুপ কর হতভাগী, কানে গেলে এখুনি ছুটে আসবে, আবার ধরবে চুলের মুঠি!

বলতে-বলতে নিজের খোঁপা-বাঁধা কেশপুঞ্জে হাত রাখল পুতুল, বললে—এই চুলের গোছা ধরে এমন টান দিতো, যে এক-একদিন গুছি-গুছি চুল হাতেই উঠে আসত নতুন মার। চুলের গোড়া বেয়ে রক্ত পড়ত, মাথা ফুলে উঠত, সে যে কী ভয়ানক যন্ত্রণা, তা আমি বলে বোঝাতে পারব না।

রুদ্ধ কণ্ঠে বলে উঠলাম—থাক, ওসব আর বলোনা তুমি।

—না !—দীর্ঘশ্বাস ফেলে সে বলল—বলে আর বোঝাতে পারব কতটুকু ? তার ওপরে, বিশ্বাস করবে, পেটে পেতাম না খেতে। নতুন মা বলতো—আমার মেয়ে দুটো খেতে পায় না, শরীর কাঠি-কাঠি, এটা ফুলছে দেখ দিন-দিন। না খাইয়ে না খাইয়ে শুকিয়ে মারতে হয় !

ভাগ্যিস, মেজদি-সেজদির বিয়ে হয়ে গিয়ে তারা শ্বশুরবাড়ি চলে গিয়েছিল, নইলে তাদের অদৃষ্টে কী হতো, কে জানে ! মুখ ফুটে বলতে লজ্জা করে, তবু বলছি, এক-একদিন খিদের জ্বালায় পাগলের মতো হয়ে উঠতাম। দু'বেলা দু'মুঠো ভাত ছিল বরাদ্দ, তা-ও সবার খাওয়া শেষ হয়ে গেলে। আর কিছু নয়। জল-খাবার কাকে বলে, সে এই নতুন-মা আসার সঙ্গে সঙ্গেই ভুলে গিয়েছিলাম। এইবার বলো, এই অবস্থায় আমি যদি চোর হয়ে উঠি, তাহলে সেটা কী ঘোরতর অপরাধ ?

কোনো উত্তর দিতে পারলাম না।

সে বলতে লাগল—অথচ, তাকে যে চুরি বলে, তা-ও আমি জানতাম না। আমের দিনে আমবাগানে গিয়ে ঢুকে আম কুড়োতুম, সে-ই ছিল আমার খিদের জ্বালা মেটাবার মতো এক-মাত্র সম্বল। শুনতাম, গাছের আম পাড়লে চুরি করা হয়, কিন্তু মাটিতে যে-আম পড়ে থাকে, তা কুড়োলে কোনো অপরাধ হয় না। খুঁজতে খুঁজতে কার বাগানে ক্ষিদের জ্বালায় সেদিন যে ঢুকে পড়েছিলাম মনে নেই, হঠাৎ জোয়ান মতো দুটি লোক এসে দুদিক থেকে চেপে ধরল আমার হাত, কেড়ে নিলো কোঁচড়ের আম ক'টি। কতো কাঁদলাম, শুনল না, নিয়ে গেল পুলিশের ফাঁড়িতে। আটকে রাখল হাজতে। একটা পুরো দিন আটকে রেখে ছেড়ে দিলো ছোট-মেয়ে বলে। কিন্তু, তার থেকেও অপমান,

তার থেকেও লাঞ্ছনা যে আমার পাওনা ছিল বাড়ীতে, তা কি সেদিন নিজেই জানতাম! ঘটনাটা মুখে মুখে ততক্ষণে সারা গাঁয়ে এমন ছড়িয়ে গেছে যে, যা করেছি, তার থেকে ঢের বেশী অপরাধে অপরাধী মনে করে সেদিন আমার গায়ে হাত তোলেনি কে? মা ত চ্যালাকাঠ দিয়ে পিটিয়ে আমাকে আধমরাই করে ফেলল। শুধু কি তাই, সে লজ্জার কথা আমি মুখ ফুটে বলি কী করে? মার-ধোর করে গাঁয়ের লোক চলে গেছে, হয়ে আসছে সন্ধ্যা, মা-র আক্রোশ তখনো কমে নি। আধমরার মতো উঠোনের ধারে বসে হিক্কা তুলছি—কাঁদবার শক্তিও আমার নেই। ফাটা কপালটা দিয়ে রক্ত ঝরছে, সেই রক্ত চোখে পড়ে চোখ ঝাপসা করে দিচ্ছে, একটা হাত তুলে সেই রক্ত মুছে ফেলছি। সেগুলি যে রক্ত, তা-ও তখন বুঝিনি, মনে হচ্ছিল বুঝি—জল। কী করে বুঝি জল পড়েছে মাথায়। ও যে রক্ত, সেটুকু বুঝবার মতো অনুভূতিও ছিল না। ছোট আমি তখন, এগারো-বারো বছরের—এখনকার মতো ফ্রক পরার রেওয়াজ ছিল না, জামা পরার রেওয়াজ ছিল না, শুধু একটি শাড়ি ছিল গায়ে জড়ানো। আর বড়দি এ বাড়িতে এসে জমানো শাড়ির পাড় দিয়ে দিয়ে জুড়ে, হাতে সেলাই করে একটা ইজের তৈরি করে দিয়েছিল। আজ ভাবি, বড়দির দেওয়া সেই ইজের ভাগ্যিস ছিল আমার পরনে। নতুনমা হঠাৎ আবার এসে আমার হাত ধরে হিড় হিড় করে টানতে টানতে নিয়ে গেল। কতো কাঁদলাম—মা, তোমার পায়ে পড়ি, আর মেরো না, আমি আর চুরি করব না।

কিন্তু, কে শোনে আমার কথা! বলল—বাপের নাম ডুবালু—বাইর হয়া যা যেইটে খুশি। বাড়িত্ ফির পা দিবু ত, তোর ঠ্যাং খোঁড়া করি দিম্।

—এই ভরসন্ধ্যেয় আমি কোথায় যাবো মা!—বলে জড়িয়ে ধরলাম নতুন-মার পা দুখানি। তখন মাথায় খুন চেপে গেছে, চুলের গোছা ধরে টানতে টানতে হ্যাঁচড়াতে-হ্যাঁচড়াতে নিয়ে গেল বাগান ছাড়িয়ে রাস্তার কাছ বরাবর। তারপর করল কী জানো, মেয়েমানুষ হয়ে মেয়েমানুষের করল সর্বনাশ! আমার পরনের শাড়িখানা পর্যন্ত টান মেরে খুলে নিয়ে গেল। ঐ ইজের-পরা অবস্থায় বুকে দুখানি হাত রেখে মুখ গুঁজে কাঁদছি, আর পাগলের মতো বলছি—মাগো, আর পারি না, আমাকে তোমার কাছে নাও।

ঠিক এমন সময় দেখি, কে আমার মাথায় হাতখানা রেখে আছেন দাঁড়িয়ে। মাথায় পাকা চুল, পাকা দাড়ি, মুসলমান ফকিরের মতো মূর্তি। বললেন—কে মা তুমি? কাঁদছ কেন, কী হয়েছে?

ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে তাঁকে সব বললাম। শুনে তাঁর কী মনে হলো কে জানে,

বললেন—আসবে আমার সঙ্গে?

আমি তাঁর হাতখানা সজোরে চেপে ধরে ছিলাম। তাঁর গায়ের আলখাল্লাখানা খুলে আমাকে দিয়েছিলেন। সেটা জড়িয়ে কোনক্রমে তাঁর হাত ধরে চলতে শুরু করেছিলাম। হাঁটতে কী পারি? শেষ পর্যন্ত তিনি দু'হাতে আমাকে পাঁজাকোলা করে তুলে নিয়ে এসেছিলেন এই মসজিদে।

সেই থেকে এই বাবার কাছেই আমি থেকেছি। বাবা নিজের হাতে আমাকে মানুষ করেছেন, এমন কি লেখাপড়াও শিখিয়েছেন কিছু-কিছু। ধীরে ধীরে বড় হয়েছি, কতো বাজে লোক আশেপাশে ঘুর ঘুর করত, উনি পাহাড়ের মতো আড়াল দিয়ে ঠেকিয়েছেন সব ঝড়ঝঞ্ঝা। ওদিকে আমার গাঁয়ে হয়েছে বিশ্রী সব রটনা। আমি

নাকি মুসলমান হয়ে গেছি। মনে মনে একটা বিদ্রোহও ছিল। ভাবতাম, হলেই বা ক্ষতি কী? বাবাকে বলতাম—উর্দু শেখান না কেন?

বাবা হেসে বলতেন—ও শিখে তুই কী করবি বেটী? ভালো করে বাঙলা শেখ, তোর সঙ্গে সঙ্গে আমারও সব শেখা হয়ে যাবে।

বলতাম—আমি মুসলমান হবো।

—ছিঃ! বাবা তিরস্কার করতেন, বলতেন তুই হিন্দুর মেয়ে, হিন্দুর মতোই তোকে মানুষ করতে চাই। বড়ো হয়েছিস, এইবার ভালো দেখে তোর একটা বিয়ে দেবো।

তা বিয়ে তিনি সত্যিই দিয়েছিলেন। প্রায় পঞ্চাশের মতো নাকি বয়স, কিন্তু দেখায় যেন তিরিশ বছরেরটি! লম্বা-চওড়া চেহারা, রাস্তা দিয়ে যেতে-যেতে আমাকে দেখে নাকি তার ভালো লেগে যায়। সেই থেকে শুরু হলো তার আসা-যাওয়া। নামটা মুখে আনবো? না, আজ আনলে আর দোষ নেই, মহেশ সিং। এত এসেছে-গেছে, ঘুণাক্ষরে জানায়নি, তার একটা সংসার আছে, বউ আছে, ছেলেপিলে আছে। মুসলমানদের ঘরে থাকা মেয়েকে যে বিয়ে করতে চেয়েছে, এইতেই বাবা খুশি, অতো খোঁজখবর বাবাও আর নেয়নি। হয়ে গেল বিয়ে, এখানেই। এবার তবু লোকজন কিছু এসেছে, সেবার বাবা আর বুড়ো পুরুত ঠাকুর ছাড়া আর কেউ ছিল না। বাবাকে ত দেখেছ, ফকীর মানুষ বললেই হয়, কতো কষ্টে যে তাঁর নিজের চলে, তা একমাত্র আমিই জানি। সেই বাবা যে মুখে রক্ত উঠিয়ে বাড়তি কত-কী কাজ করে কিছু টাকা জমাচ্ছিলেন গত দু'তিন বছর ধরে,—তার খবর কী আমিই জানতাম? বিয়ের সময় দেখি, হাতের চুড়ি দিলেন সোনার দুগাছা

করে, গলায় সরু হার, তা-ও সোনার। দুটি আংটি, একটি আমার, একটি বরের জন্য।

এইখানে একটু থামল পুতুল, ভিতরের উদ্গত আবেগ দমন করে নিয়ে বললে—থাক বাবার কথা! মানুষের শরীর নিয়ে যে এমন দেবতা বাস করতে পারেন, তা যেন আমারই মাঝে মাঝে বিশ্বাস হতো না, অন্যে বিশ্বাস করবে কেমন করে? এদিকে নিজে অগাধ পণ্ডিত, বাইরে থেকে তা বোঝবার উপায় নেই। আমাকে বলেছিলেন—পণ্ডিত রেখে তোকে এবার সংস্কৃত পড়াবো মা। তোরও পড়া হবে, আমারও শেখা হয়ে যাবে।

একবার বললেন—সদরে গিয়ে ম্যাট্রিক পরীক্ষাটা দিবি মা? ইংরেজী আর অঙ্কটা শিখতে পারলেই হয়। ও দুটো আমার আবার তেমন জানা নেই।

কিন্তু বিয়ে হয়ে যাবার দরুণ এসব আর কার্যে পরিণত হয়নি। বর আমাকে নিয়ে এ-বাড়িতে ছিল ক্রমান্বয়ে সাতদিন। তারপরে চলে গেল গাজোল, বলে গেল, বাসা-টাসা ঠিকঠাক করে তোমাকে এসে নিয়ে যাবো।

তা এলো প্রায় মাসখানেক পর দুতিন দিনের জন্য। থাকল। বললে—নতুন ঘর তুলতে হবে। ভাঙা ঘরে তোমায় নিয়ে রাখব কোথায়? চলে গেলো। আবার এলো প্রায় মাসদুয়েক পরে। মাঝে একখানা চিঠি দিয়েছিল, তাতে ছিল ঠিকানা! বাঙ্গালপাড়া, গাজোল। এবার এসে বললে—ঘরের সব হয়ে গেছে, চালটা বাকী। টালির ছাদ করব। তোমার চুড়ি আর হারখানা দাও না, বাঁধা দিয়ে টাকা জোগাড় করি। তারপরে ক্ষেত থেকে তামাকপাতা ঘরে উঠলে, তোমার জিনিষ ছাড়িয়ে এনে তোমাকেই দিয়ে দেবো, মেরে দেবো না। অবুঝ ছিলাম, আর বলতে বাধা

নেই, মায়াও ততদিনে জন্মেছে লোকটার ওপর। এক কথায় দিয়ে দিলাম, এমন কি বাবাকে না জানিয়ে চুপি চুপিই দিয়ে দিলাম তাকে। আর, এই দেওয়াই হলো কাল। এদিকে একদিন আমার বাবা এসে উপস্থিত। বললেন—যা হবার হয়ে গেছে, ঘরে ফিরে চল। একটা মানুষ যখন পেয়েছিস, আর ঐ মুসলমানটাও তোকে যখন ছেড়েছে, তখন না হয় প্রাচিত্তির করে জাতে উঠব। তুই চল। তোর মা-ও কাঁদে আজকাল তোর জন্যে।

গেলাম। না গিয়ে উপায়ও ছিল না। আলিসাহেব গরীব মানুষ, তার ওপর আরও একটা মানুষের পেট চালাতে তার যে কী কষ্ট হয়, আমার ত তা অজ্ঞাত নয়। যা খুদকুঁড়ো জমানো ছিল, সব গেছে আমার বিয়েতে, তার ওপরে কর্জও হয়েছে তাঁর। সেই কর্জও মাথার ওপরে। এসব সাত-পাঁচ ভেবেই গাঁয়ের পথে রওনা হলাম। সেই শকুন্তলা-গল্পের কণ্বমুনির মতোই আমাকে সেদিন বিদায় দিয়েছিলেন আলিসাহেব। কিন্তু, লোকে তা কি কোনদিন বুঝেছে? আমার নিজের বাবাও কি বুঝেছে? মানুষটার পাকা চুল, পাকা দাড়িও তাদের বিশ্রী রটনা থেকে নিরস্ত করতে পারেনি।

বাড়ি আসবার পর বাবা ত প্রায়শ্চিত্ত করে জাতে উঠলেন। কিন্তু, সংসারের অবস্থা দেখে আমার ত চক্ষুস্থির! শুনলাম, কী এক মামলা করতে গিয়ে বাবার জমি জমা সব গেছে, নতুন মায়ের সম্পত্তিটুকুও বাঁধা পড়ে আছে। স্বাস্থ্যও ভেঙ্গে পড়েছে বাবার। নতুন-মা অবশ্য আর আগের মতো ব্যবহার করত না, কিন্তু এরা যে এক-একবেলা মাত্র শাক সিদ্ধ করে খেয়ে পড়ে থাকে, দূর থেকে তা আর বুঝব কেমন করে? তদুপরি, বাবার কী রকম ধারণা হয়েছিল, মহেশ সিং আমাকে খুব দেয়-থোয়। গাঁয়ের লোকেই

ওসব রটনা করে থাকবে আর কী। তাই শুরু হোলো, এটা দে-সেটা দে—এইসব।

দিলাম। চোখের ওপর বড়দির ছেলেমেয়েগুলি উপোস করে পড়ে থাকবে, এ আমি সহ্য করব কেমন করে? হাতের আংটি গেল, এমন কি, দু'চারখানা বাসন যা আলিসাহেব দিয়েছিলেন, তা-ও গেল। শেষ পর্যন্ত বাবা বললেন—মহেশের কাছে যা, চেয়েচিন্তে নিয়ে আয় কিছু।

আমি যে মহেশের বিবাহিতা স্ত্রী, একথা গাঁয়ের লোকও বিশ্বাস করেনি। এবং মুখে কিছু না বললেও, এটুকু বুঝতাম, বাবাও বিশ্বাস করেননি। মুসলমানে-ছোঁয়া মেয়েকে কি কেউ বিয়ে করতে পারে দেশে-গাঁয়ে? সে সব হয় কলির রাজ্যে—কলিকাতায়। এখানে একটু থেমে গেল পুতুল। বললে—যাওয়া শুরু করলাম মহেশের বাড়ি। সেখানেও সতীনের অত্যাচার। আমি যে মহেশের বিয়ে-করা বউ, এটা এরাও কেউ বিশ্বাস করল না। বলতাম। ওদের সামনেই সেই লোকটিকে বলতাম—আমি যে তোমার রক্ষিতা নই, আমি যে তোমার বিয়ে-করা বউ, এটা কাউকে বলতে পারছ না? চুপ করে থাকত। আর ব্যঙ্গহাস্যে মুখর হয়ে উঠত আমার সতীন। বলতাম—আমি যাবো না, এই আমার স্বামীর ঘর, আমি এখানেই থাকব। তাড়াও দেখি কার ক্ষমতা?

যেমন করে ছোটবেলায় নতুন-মা তেড়ে আসত চ্যালাকাঠ নিয়ে, তেমনি করেই রাক্ষুসীর মতো তেড়ে আসত সতীন। আমি আতঙ্কিত হয়ে ছুটে পালাতাম। কী এক পর্বের দিন যেন। বাড়িতে সেদিন চাল বাড়ন্ত, ঘরে বাসন-কোসনও আর নেই, আমাদের আটপৌরে দু'একখানা শাড়ি ছাড়া আর শাড়িগুলি

পর্যন্ত নেই, বড়দির কোলের ছেলেটা ক্ষিদের জ্বালায় কেঁদে কেঁদে ছটফট্ করছে উঠোনের ওপরে। কঙ্কালসার বড়দি বোধহয় নিজে কাঁদতেও গেছে ভুলে, শূন্যদৃষ্টিতে চেয়ে আছে আকাশের দিকে। আমি আর থাকতে পারলাম না, পায়ে হেঁটে রওনা দিলাম গাজোল। সে কি একটুকু পথ? আসতে আসতে বেলা হয়ে গেল। দেখি, সতীনের গলায় সোনার হার, হাতে ছ'গাছা করে চুড়ি। নক্সা দেখেই বুঝতে পারলাম, জিনিষগুলি কার। চিৎকার করে উঠলাম—ঐ ত আমার গয়না—দিয়ে দাও বলছি! সেদিন শ্বশুরবাড়ির লোকেরা সবাই আমার গায়ে হাত পর্যন্ত তুলতে দ্বিধা করেনি। কাঁদতে কাঁদতে হতভম্ব লোকটাকে বলেছিলাম—বলতে পারছ না, গয়নাগুলি আমার!

কিন্তু কাকে বলছি কথা! একটা পাথরকে বলাও যা, ওকে বলাও তা। নিদারুণ আক্রোশ আর ঘৃণায় লোকটাকে যেন ছ'হাতের নখ দিয়ে আঁচড়ে ক্ষতবিক্ষত করে দিতে ইচ্ছা করল।

এর ঠিক ছ'দিন পরেই বড়দির ছোট ছেলেটা মারা গেল। মারা গেল ছটফট করতে করতে। খেতে না পেয়ে। গাঁয়ে তখন চালের দাম আগুন, গাঁয়ের বহু ঘরেই চাল বাড়ন্ত, কে কাকে দেখে, কে কার খোঁজখবর রাখে। আমি সেদিন সত্যিই গেলাম পাগল হয়ে। আবার হেঁটে এলাম গাজোল। আসতে আসতে সেদিনও সন্ধ্যা হয়ে গেল। দেখি, উঠোনে কেউ নেই, ঘর খোলা। সতীন ঘাটে-টাটে গেছে বোধ হয়। চুপি চুপি ঢুকে পড়লাম ঘরে। তারপরে কী যে করেছি, কীভাবে যে গয়না পেয়েছি মনে নেই, সেই হার, আর সেই চারগাছা চুড়ি। কিন্তু, ছুটে ছুটে পালাবো আর কোথায়? ধরা পড়লাম। পুলিস। আদালত। কী আর বলব, প্রমাণ হলো না, আমি মহেশের বিবাহিতা স্ত্রী, প্রমাণ

হলো না, ও গয়না আমার। প্রমাণ হলো না, যে চুড়ি-হার চুরি করেছিলাম, ও আমার, একান্তই আমার। আমার কণ্বমুনি—আমার বাবা—আমার আলিসাহেবের দেওয়া অতি কষ্টের জিনিষ—আমার চুড়ি আর হার। আসামীর কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে শুনলাম—মহেশও বলে গেল, আমি তার স্ত্রী নই। বললে—ও গহনা তার নিজের। নিজের কিনে দেওয়া, নিজের স্ত্রীকে। লজ্জায়-ঘৃণায় আর একটি কথাও বলিনি। সরকারী উকিল ততক্ষণে বলে চলেছে—আমি স্বভাব-চোর, আমি চুরি করে থানায় গিয়েছিলাম, ইত্যাদি। শুধু আমার কণ্বমুনির চোখে দেখেছিলাম জল। এত খোঁজ করেও সেই বুড়ো পুরুতটির সন্ধান করতে পারেন নি তিনি। সবার দেওয়া সব অপবাদ—সব লাঞ্ছনা সেদিন তাঁকে নিতে হয়েছিল মাথা পেতে, কেউ না—কেউ বিশ্বাস করেনি তাঁর কথা।

কিন্তু, এ-ও আশ্চর্য নয় আমার কাছে। আমি আশ্চর্য হলাম সেদিন, যেদিন শুনলাম, মহেশ সিং গলায় দড়ি দিয়ে আত্মহত্যা করেছে। তাহলে, বিবেকজ্বালা, অনুশোচনা, আত্মগ্লানি,—এসব শব্দ মাত্র বিদ্যাসাগর মশায়ের বর্ণপরিচয়ে না থেকে মানুষের অন্তরেও আছে? সত্যি কথা বলতে কী, লোকটা ওভাবে মরে আমাকে সেদিন জয় করে গিয়েছিল।

বলতে বলতে গলা কেঁপে গেল পুতুলের। সে শ্রান্ত হয়ে রেলিং-এ মাথা রেখে দুটি চোখ বুজে চুপ করে রইল।

ততক্ষণে আলো হয়ে উঠেছে সংসার, পাখীরা কলরব করতে করতে বসছে এ গাছ থেকে ও গাছে। সামনের একটা অশথগাছের ডালে প্রচুর বাবুই পাখীর বাসা! একটু অবাক হলাম, অশথগাছে এসে যে বাবুই বাসা করে, এ আমি আগে কখনো দেখি নি।

কতক্ষণ আরও কেটে গেল জানি না, হঠাৎ হাতটা রেলিং থেকে টেনে নিতে গিয়ে দেখি, হাতখানা পুতুলের হাতের মধ্যে ধরা। বললাম—বলতে গিয়ে আমার কণ্ঠস্বরও বুঝি কেঁপে গেল—ভগবান এবার তোমার জীবন সুখের করুন।

মুখ তুলে সোজা হয়ে দাঁড়ালো পুতুল, বললো—ভগবান করবে না, আমাকেই করতে হবে।

বলে আমার খুব কাছ ঘেঁষে দাঁড়ালো মুখোমুখি, বড়ো কোমল, বড়ো স্নিগ্ধ ওর চোখের দৃষ্টি, বললে—ভেবো না, আমি ঠিক মানিয়ে নিয়ে চলবার চেষ্টা করব।

কোনো কথা নয়, বুকের মধ্যে কী এক দুর্দমনীয় আবেগ মোচড় দিয়ে উঠে কণ্ঠ পর্যন্ত আসতে চায়, কিন্তু স্বর হয়ে ফুটতে পারে না বলে গুম্‌রে গুম্‌রে মরে। দীর্ঘশ্বাস ফেলে পুতুল বললে—এসো।

যন্ত্রচালিতের মত এসেছিলাম। যন্ত্রের মতোই ফিরে চললাম ওর পিছনে পিছনে। আলিসাহেবের মাদুরটা পড়ে আছে, উনি নেই, প্রাতর্ভ্রমণে বেরিয়ে গেছেন ততক্ষণে। বাড়ির ভিতরে ঢুকে দেখি, মহাবীরও তখন ঘুম ভেঙে উঠে বসেছে দাওয়ায়। আমাদের দেখে চোখ তুলে তাকালো, মুখে ফুটিয়ে তুললো মৃদু একটা হাসি, কিন্তু সে হাসি আমার ভালো লাগলো না।

এর পরের ঘটনা সংক্ষিপ্তই হওয়া উচিত। কিন্তু, তা হয়নি। যা হয়েছিল, তা আরও ঘোরালো, আরও নিদারুণ। আমার পক্ষে তা বলাও কঠিন! তবু বলতে হবে, না বললে একটি আশ্চর্য জীবনের ইতিকথা অসমাপ্তই থেকে যাবে।

মহাবীরকে বললাম—বউ নিয়ে উঠবে কোথায়?

শুষ্কমুখে বললে—কিছুই ত নেই।

বললাম—দুদিন এখানেই থাকো। আমি গিয়ে ব্যবস্থা করছি।

সেইদিনই চলে এসেছিলাম। গাজোল থেকে দেওতলার দিকে ক্রোশখানিক হেঁটে গেলে একটা গ্রাম পড়ে, সেই গ্রামে এক কিষাণের কাছ থেকে খাজনায় কিছু সামান্য জমি পাওয়া গেল। লোক লাগিয়ে একখানা চালাঘর তোলাবার ব্যবস্থাও করেছিলাম। দুদিন পরে মহাবীর একা যখন ফিরে এলো ব্যারাকে, তখন আমার ব্যবস্থা দেখে বিস্ময়ে অভিভুত না হয়ে পারল না। বললাম— ভিৎ উঠছে। ঘরও হয়ে যাবে। বেড়া বেঁধে নাও। আর কী সুন্দর এই জাম গাছটা। একেবারে উঠোনের ওপরে নুয়ে পড়েছে অতিকায় গাছটার ডাল। খুব ছায়া পাবে উঠোনে। তাই না?

ও-কিছু বললে না। কিন্তু দেখলাম নিজেই লেগে গেল ঘরামীর সঙ্গে।

উঁচু ক'রে উঠোনের চারিদিকে যে বেড়া তুলছে, এ-ও দেখে এলাম একদিন। যাক্, ওদের স্থিতি হয়েছে, এবার আমার ছুটি। নিশ্চিন্ত হয়ে বাড়ি গেলাম এবার। মায়ের কাছে। বললাম— কয়েক রবিবার আসতে পারিনি ব'লে রাগ করেছ মা? রাগ করতে হবে না, অঘ্রাণের প্রথম বিয়ের দিনই সব ব্যবস্থা করো।

তারপরে, দেখতে দেখতে এসে গেল অঘ্রাণ। এক শুভদিনে রাধি এসে উঠল আমার ঘরে।

শুভার আর আনন্দ ধরে না। ঠাট্টা ক'রে বলতে লাগল— 'রাধা গেল জল ভরিতে, কানাই নিলো পাছ! হাতের বাঁশী ফেল্যা থুইয়া কানাই মারে মাছ!'

রাগ ক'রে ব'লে উঠলাম—দেখ মা, তোমার মেয়ে কেমন লায়েক হয়ে উঠেছে! ধামালির ছড়া কাটছে।

রাধা রাত্রে আমাকে একা পেয়ে বললে—সেই মাইয়াটার নামটা কী হয়?

—কোন্ মাইয়াটা ?

—ঐ যে যার বিয়া দিয়া আইলেন ?

বুঝলাম সব। কিন্তু কোথা থেকে শুনেছে, কতুটুকু শুনেছে, এসব নিয়ে আর বৃথা জিজ্ঞাসাবাদ না ক'রে সংক্ষেপে বললাম—পুতুল।

—বাঃ! নামটা ত ভালয় হয়! তা মানুষটা ক্যামন ?

—বেশ।

—মনত্ ধরে নাকিন্ ?

আশ্চর্য হয়ে বললাম—কার ?

মুখ টিপে হেসে বললে—ফির আরও কার! তোমার।

বললাম—তাহলে কি তুমি আসতে ঘরে ? সেই আসত।

—মুঁই আইসছো ক্যানে ?

—কপাল।

—তা, তার সে কপাল ক্যানে হয় নাই ?

বললাম—তার কপাল আরও ভাল। আরও ভাল লোকের ঘরে সে গেছে।

আর কিছু বলল না রাধা, আমিও নিশ্চিন্ত হলাম। এসব কথা নিয়ে কারুর সঙ্গে আলোচনা করতে একেবারেই ভালো লাগে না। বিয়েতে মহাবীর এসেছিল, সে আসেনি। আসবে না তা-ও আমি জানতাম। ওদের নতুন ঘরে গিয়েছিলাম নিমন্ত্রণ জানাতে।

বলেছিলাম—আলিসাহেব কেমন আছে ?

—ওঁর আর ভালো থাকা! ফকির মানুষ।

—তুমি আছো কেমন, তোমার নতুন ঘরে ?

মহাবীর তখন ছিল না কাছে, আমার কথায় ছলছল ক'রে

উঠেছিল দুটি চোখ, একটুক্ষণ থেমে থেকে, তারপর বলেছিল—খুব ভাবো, না ?

—কী ?

বললে—ভেবোনা, ঠিক মানিয়ে চলব।

কথাটা একবার নয়, বহুবার বলেছে ও' আমাকে। এ-যেন ওর আত্মগত চিন্তা। বার বার কথাটা ব'লে নিজের মনটাকে স্থির রাখা।

হয়ত, অবসর বুঝে, কুশল-সংবাদ জানতে গেছি, মহাবীর দাওয়া থেকে উঠে এসে আমাকে সমাদর জানিয়েছে, বসিয়েছে দাওয়ার প্রান্তে, তারপর, এ-কথা-সে-কথার পর কোনো একটা কাজের অজুহাত খুঁজে উঠে গেছে কাছ থেকে। আর ঠিক সেই সময় রান্নাঘর থেকে বেরিয়ে এসেছে পুতুল, এসে কাছে দাঁড়িয়েছে, মৃদুকণ্ঠে প্রশ্ন করেছে—আছো কেমন ?

বলতাম—সে কথা যে আমিই তোমাকে জিজ্ঞাসা করতে এসেছি !

ও মুখখানি নত করত তৎক্ষণাৎ। বলত—ভালো আছি।

—বেশ।

মুখ তুলত আমার দিকে, চোখেব ওপর চোখের দৃষ্টি মুহূর্তকাল নিবদ্ধ রেখে ব'লে উঠত—কী মনে হয়, মানিয়ে চলতে পারছি না ?

—মনে ত হয়, পারছ।

কণ্ঠে জোর এনে, ঠোঁটের কোণে হাসি টেনে এনে, ও ব'লে উঠত—অতো ভাবো কেন ? এ-ভাবে ঠিক মানিয়ে চলতে পারব সারাজীবন !

এর কিছুক্ষণ পরেই উঠে চলে আসতাম।

এবং তারপরে, যতোবারই গেছি, ঘুরে-ফিরে ঠিক ঐ একই

ধরনের কথাবার্তা। সেই ওর হেসে-হেসে কথা বলার প্রয়াস,—দেখো, ঠিক মানিয়ে চলব যতদিন বাঁচি।

এইভাবে, যতদিন কেটে যেতে লাগল, যতই শুনলাম একান্তে ওর এই কথা, ততই শঙ্কিত হয়ে উঠতে লাগলাম ভিতরে-ভিতরে। মনে হতে লাগল, পুতুলের মন এত অস্থিরই বা হয়ে উঠছে কেন সংসারে এসে ?

ওর মধ্যে যতোই অনুভব করি এই অস্থিরতা, ততই মনটা চিন্তার জালে জটিল হয়ে উঠতে চায়। এক-এক সময় মনে হয়, তাহলে, মহেশকে কি ও' এখনো ভুলতে পারেনি ?

কিম্বা, ওর অন্তরে, ওর নারী-সত্ত্বার সামনে আজ মহেশও দাঁড়িয়ে নেই, এমনকি মহাবীরও দাঁড়িয়ে নেই, দাঁড়িয়ে আছে অন্য কেউ ?

কিন্তু, কে সে ? কে সেই 'অন্য কেউ ?'

কথাটা মনে হতেই চমকে উঠি। আর তারপরে, যতো এই চিন্তায় অবতরণ করি, ততই শঙ্কায় কাঁপতে থাকে মন। আছি ত আমিও ভালো আমার রাধাকে নিয়ে আমার সংসারে, তবু, কাজের ফাঁকে ফাঁকে, অথবা একা-একা পথ চলতে-চলতে, কিম্বা, নিশীথ রাত্রে, রাধা বাহুলগ্না হয়ে ঘুমিয়ে পড়বার পর,—অতর্কিতে ঐ আশ্চর্য মেয়েটির কথা কেন এত মনে পড়ে ? যখন-তখন কেন ইচ্ছা করে, মহাবীরের বাসায় গিয়ে, মহাবীরের সুখ-সংবাদ নেওয়ার ?

মহাবীর বলে—চল্লিশ বছর বয়স হলো, বিয়ে-বিয়ে ক'রে মাথা খুঁড়ে মরেছি, কেউ মেয়ে দেয় নি। তোমারই জন্য বউ পেলাম ভাই, কিন্তু ভয় হয়, ওকে না হারিয়ে ফেলি।

—সে কী ! হারাবে কেন ?

মহাবীর আমার দিকে পুরোপুরি মুখখানা ফিরিয়ে তাকালো এবার। ওর মুখের ভাব দেখে মনে হচ্ছিল, ও যেন অসহায় কোনো পথ-হারা বিহ্বল পথিক! ব্যাকুলকণ্ঠে ব'লে উঠল— আমাদের সমাজের কথা জানো না ত! আমি রইলাম সারাটা জীবন দেশের বাইরে-বাইরে, এতে, হয়ে গেছি যাকে বলে, না ঘরকা, না ঘাটকা। দেশে গেলে সবাই হেসে কথা বলে বটে, কিন্তু সমাজে নিতে চায় না, নানারকম তাদের সন্দেহ, তাছাড়া বংশের খুঁৎতো আছেই! আর, এখানে? এখানেও সবাই হেসে কথা বলে, কিন্তু সমাজে নিচ্ছে কই? তাই বলছি ভাই, যদি-বা কপালে বউ একটা জুটল, ওটি না আবার খোয়া যায়!

একটু হাসলাম, বললাম—যেভাবে ঘরে বন্দী করে রেখেছো, হারাবার ভয় তোমার নেই।

আমার কথায় অবাক হলো মহাবীর, বললে—বন্দী করে রেখেছি মানে? ও-ই ত কোথাও যেতে চায় না!

বললাম—সে এক কথা। কিন্তু উঠোনের চারদিকে যেভাবে উঁচু বেড়া দিয়ে রেখেছ, তাতে অন্য রকম সন্দেহ হয়। পুতুলকে তুমি ঠিক বিশ্বাস করতে পারো না।

মুখখানা সঙ্গে সঙ্গে কালো হয়ে উঠল মহাবীরের, কিছু আর বলল না।

ও-দিকে, দেখতে দেখতে, থানায় যেন কী ক'রে কথাটা একদিন ছড়িয়ে পড়ল। আমাদের মেস্-বাড়ী বা ব্যারাকে খাটিয়ায় শুয়ে সেদিন বিকেলে একটু বিশ্রাম করছি, এমম সময় পাশের দু-তিনটি কনেষ্টবল একজোট্ হয়ে হাসাহাসি স্থরু করে দিয়েছে হঠাৎ। এ রকম অবশ্য খুবই হয়। সামান্য তুচ্ছ ব্যাপার নিয়েও কৌতুক আর পরিহাসের অবধি থাকে না আমাদের ব্যারাকে। কিন্তু,

সেদিনকার ব্যাপারটা মনে হলো একটু অন্য রকম। ওদের কথা-বার্তার মধ্যে মহাবীরের উল্লেখ থাকায় স্বভাবতই একটু উৎকর্ণ হয়ে উঠলাম ওদের আলোচনার ব্যাপারে।

যা আশঙ্কা করেছিলাম, তা-ই হলো। কী করে ওরা যেন জানতে পেরেছে, মহাবীর বিয়ে করেছে একটা কয়েদী মেয়েকে। আমি উঠে বসলাম বিছানার ওপর, বললাম—এই, হচ্ছে কী?

ওরা আমার দিকে ফিরে তাকিয়ে আরও জোরে-জোরে হেসে উঠল। একজন বললে—কুলার বাতাস দে, কুলার বাতাস দে, দোস্তের কুৎসা গায়ে লাইগছে্!

বললাম—কী করেছে শুনি মহাবীর?

ক্যানে? কয়েদী-মাইয়াটাক নিকা কইরছে, তুমি জানেন না?

বললাম—যদি করেই থাকে ত, তাতে অন্যায় কী হয়েছে শুনি?

একজন বললে—গায়ে যে তীর ফুইটছে! বেত্তান্তটা কী? দোস্তক ছাড়িয়া দোস্তর কইনার দিকে নজর পড়িল্ নাকি হে?

সঙ্গে সঙ্গে হা-হা ক'রে চলল সে কী কুৎসিত হাসি ওদের!

তীব্র কণ্ঠে বলে উঠলাম—চুপ করো।

ইয়াসিন বললে—চুপ চাপইত আছি দোস্ত! চিক্কুর দিলে কি ওই মেস্-বাড়ীত তুই দোস্তে থাইকপার পাইল্লেন হয়?

এ-কথার উত্তরে আমি একটা-কী বলতে গিয়েছিলাম যেন, কিন্তু ঠিক সেই মুহূর্তে ঘরের মধ্যে এসে ঢুকল কনেষ্টবলের পোষাকে মহাবীর, আর সঙ্গে সঙ্গে ওদের চটুলতার ধারা প্রবাহিত হয়ে গেল অন্যদিকে।

মহাবীর সেই যে উক্তি করেছিল আমার কাছে, 'চোর বিয়ে করলে লোকে থু-থু দেবে',—তা অবশ্য কেউ দেয়নি, কিন্তু ঠাট্টা করতে ছাড়ে না ওকে কোনো কনেষ্টবলই।

একজন বললে—খাওয়ানটা বাদ দিলে হে মহাবীর !

অপরজন বললে—বউ দেখাও ক্যানে একদিন !

সব কথার উত্তরে মহাবীর মুখ কালো ক'রে চুপ করে থাকে !

ওকে ক্ষ্যাপানোর জন্য আরেকজন হয়ত বললে—নিকার বউ না-ই বা দেখলাম ! ওর আর দেখব কী ? এই থানার গারদেই ত ছিল !

হো-হো করে আবার সম্মিলিত হাসি। মহাবীরের দিক থেকে তবু কোনো সাড়া দেই।

ইয়াসিন ছড়া কেটে বললে—

'চোর নিয়া ঘর কেবা করে,
তূষ অনলে দগ্ধ্যা মরে !'

মহাবীর রাগ করে উঠে চলে যায় ওদের কাছ থেকে।

এইভাবে কেটে গেল বেশ কয়েকটা দিন, কয়েকটা মাস।

দেওতলা আউটপোষ্টে মাঝে মাঝে আমাদের ডিউটি পড়ে। বিশেষ করে, ওখানকার কোনো লোক ছুটি নিলে।

একদিন রাত্রের ডিউটি শেষ ক'রে পথ দিয়ে ফিরছি, মহাবীরদের বাড়ির কাছ বরাবর আসামাত্র হঠাৎ একটা সোরগোল কানে এলো।

কী একটা সন্দেহ ধ্বক্ ক'রে জেগে উঠল মনের মধ্যে। তাড়াতাড়ি পথ থেকে নেমে পায়ে চলা পথটি ধরে সেই ওদের উঠোনে হুমড়ি খেয়ে পড়া জামগাছটির পাশ দিয়ে ঢুকে পড়লাম ওদের উঠোনে।

পাড়ার দু-একটা মেয়ে বউ আর ছোট ছেলেপিলে জড়ো হয়েছে, আমাকে দেখেই তরতর ক'রে ছুটে পালালো তারা। লাঠি হাতে দাঁড়িয়ে ছিল মহাবীর, ক্রোধান্বিত কণ্ঠে কটূকাটব্য করছিল

বন্ধ ঘরের অন্তরালবর্তিনীর উদ্দেশ্যে, আমাকে দেখা মাত্র স্তব্ধ হয়ে গেল সে।

জিজ্ঞাসা করলাম—কী হয়েছে মহাবীর?

কোনো উত্তর এলো না, দুমদাম পা ফেলে উঠোনের আগড়টা টেনে দিয়ে হন্‌হন্‌ ক'রে বড়ো রাস্তার দিকে এগিয়ে গেল সে।

পিছন থেকে চেঁচিয়ে ডেকে উঠলাম—মহাবীর!

কোনো সাড়া পেলাম না ওর, সাড়া পেলাম পুতুলের।

অনেকদিন পরেই এসেছি ওদের বাড়ি, কিন্তু ওর যে এমন খারাপ চেহারা হয়ে গেছে, এটা লক্ষ্য ক'রে চমকে না উঠে পারলাম না। চোখের নীচে কালি, শুকনো মুখ, বিষণ্ণতা আরও গাঢ় হয়ে তার ছায়া ফেলেছে। ধীরে ধীরে দরজার বাইরে, দাওয়ায় এসে দাঁড়ালো, বললে—আপনি এলেন কেন, এখন?

সচরাচর 'আপনি' ক'রে বলে না কেউ কাছে-পিঠে না থাকলে, তাই কথার ধরনে একটু অবাকই হলাম, বললাম কী ব্যাপার?

ম্লান একটু হাসল মাত্র, কিছু বলল না।

সন্দেহ আরও দৃঢ়তর হলো। জিজ্ঞাসা করলাম—মারধোর করেনি ত?

মুখ নীচু ক'রে স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে রইল, কিন্তু আর পারল না, চোখ ছাপিয়ে দেখা দিলো অশ্রুর বিন্দু।

আর, ঠিক তখ্‌খুনি মনে হলো, আমার সারা শরীরে বুঝি আগুন ধরে গেছে। হাতের লাঠি দিয়ে মহাবীরকে গিয়ে এইমাত্র পাগলের মতো এলোপাথাড়ি প্রহার না করলে বুঝি কিছুতেই শান্ত হবে না আমার এই দুর্জয় অন্তর্দাহ! কী হয়েছিল আমার মুখ-চোখের অবস্থা কে জানে, হঠাৎ দেখি, তীরবেগে পুতুল ছুটে

এসে পড়ল আমার গায়ের ওপরে, একটা হাত আমার কাঁধে আরেকটা হাত আমার অপর বাহুটির প্রান্তে রেখে, ব্যাকুল হয়ে বলতে লাগল—না-না কিছু করতে পারবে না তুমি, কিছু করতে পারবে না।

বলতে বলতে ভেঙে পড়ল হু-হু করা কান্নায়, আমাকে ছেড়ে আশ্রয় করলো ওর কুঁড়ে ঘরেরই একটা বাঁশের খুঁটি, কান্নাভরা কণ্ঠে ব'লে উঠল—কী করেছি আমি। আমার কী দোষ! অশান্তি বাঁধিয়ে আমাকে শাস্তি দিতে যাচ্ছ কেন তুমি? ওর কিছু হলে, আমি যাবো কোথায়? মারুক ধরুক—তবু ত আমার স্বামী!

নিথর নিশ্চল হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম কিছুক্ষণ।

ধীরে ধীরে ওর কান্না থেমে গেল একসময়, আমারও মন গেছে শান্ত হয়ে, শুধু বুকের মধ্যে একটা নিরুদ্ধ বেদনা বারবার গুমরে গুমরে উঠতে চায়।

আঁচলে চোখ মুছে ফিরে দাঁড়ালো আমার দিকে, বললে—আরও দুদিন যেতে দাও, দেখো, ঠিক মানিয়ে নেবো আমি।

রুদ্ধকণ্ঠে বললাম—ও তোমাকে অনাদর করবে কেন?

—অনাদর! একটু যেন অবাক হলো পুতুল, তারপরে চোখ দুটি আবার ছলছল ক'রে এলো ওর, বললে,—বড় বেশি আদর। দম বন্ধ হয়ে একদিন মারাই যাবো।

বললাম—পুতুল, সত্যি কথা বলবে। ও তোমাকে সন্দেহ করে?

বিচিত্র হাসি ফুটে উঠল ওর মুখে, বলল—কী আশ্চর্য, চোরকে মানুষ সন্দেহের চোখে দেখবে না?

উত্তেজিত কণ্ঠে বলে উঠলাম—তা বলে চরিত্র?

বললে—চোরের আবার চরিত্র!

ব্যাকুল কণ্ঠে বলে উঠলাম—বলো না কেন ওকে তোমার সব সত্য ইতিহাস ?

দৃঢ়কণ্ঠে বললে—না।

—কেন !

—বললে বিশ্বাস করবে কেন ?

আশ্চর্য হয়ে বললাম—করবে না !

—না, সবাই তোমার মতো নয়।

চুপ করে রইলাম। ও বললে—বোসো। চা করে দি, খাও।

—না।—বলে উঠলাম—দেখ, সে রকম অশান্তি হলে তুমি বরং আলিসাহেবের কাছে চলে যেও।

চোখ দুটি প্রদীপ্ত হয়ে উঠল মুহূর্তের জন্য, বললে—তা কেন যাবো ? এখানেই থাকবো।

মুখ ফিরিয়ে তাকালাম ওর দিকে সম্পূর্ণ দৃষ্টি মেলে, বললাম, থাকো, সে ত আমিও চাই। তা'বলে এমনি মারধোর সয়ে ? অবশ্য, এ-ও ভাগ্য। দেখছি তোমার ভাগ্যই খারাপ।

ও বললে—ও-কথা বলো না। আর যে যাই বলুক, ভাগ্যের দোহাই অন্ততঃ আমি দেবো না। ঢের সয়েছি ভাগ্যের অত্যাচার, আর সইব না। তুমি দেখে নিও, আমার ভাগ্যকে আমি ঠিক তৈরী করে নেবো। আর যদি না পারি, ত—

ব'লে, চট্ করে সরে, ঘরের মধ্যে চলে গেল। ফিরে এলো চক্‌চকে ধারালো একটা হাসুয়ার মতো অস্ত্র হাতে। বললে—চারদিকে চুরি-ডাকাতি হচ্ছে বলে এটা এনে রেখেছে ঘরে। দরকার হলে, অর্থাৎ যদি বুঝি, হেরে গেছি, তাহলে এটা দিয়ে নিজের গলায় কোপও বসাতে পারব।

সারা শরীরটা যেন শিরশির করে উঠল ওর কথা শুনে,

বললাম—এসব চিন্তাও করে রেখেছ ? ভালো। আমি চলি।

বললে—চলি মানে ? চা খেয়ে যাও।

'ঠিক সেই সময় কয়েকটি পাখী ঐ ঝুঁকে পড়া জামগাছটার ডালে বসে কলরব করছিল। বিরক্ত হয়ে 'হুস্—যা' বলে তাদের তাড়না করতে গিয়ে হঠাৎ বলে ফেলল পুতুল—ঐ ডালই আমার সর্বনাশ করবে দেখছি !

অবাক হয়ে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললাম—কেন ?

সেইরকম ম্লান হাসি ফুটে উঠল ঠোঁটের কোণে, বললে—এক একদিন রাত্রের দিকে এসে বন্ধ আগড়ে ঠেলা না দিয়ে, ঐ গাছে উঠে বসে। চুপি চুপি ওখান থেকে দেখতে চেষ্টা করে, ঘরে লোক আছে কিনা !

—ছি-ছি ! এরকম হয়ে গেছে মহাবীর !

ও নিজের চিন্তা যেন নিজেকেই শোনাচ্ছে, এমনিভাবে আত্মগত চিত্তে বলে উঠল—কোন্‌দিন হাত-পা ভেঙে পড়ে গিয়ে বেঘোরে প্রাণ না হারায়।

বললাম—মহাবীরের সঙ্গে একটা বোঝাপড়া করতেই হবে। এসব কী ? এসব চলবে না।

ও হাসুয়াটা দাওয়ায় রেখে এগিয়ে এসে চট্ করে ধরলো আমার হাত, বললে—বোঝাপড়া যার যতখানি খুশি করুক, তুমি যেও না। এ নিয়ে তুমি যদি একটা কথাও বলতে যাও, আমার লজ্জা রাখবার আর যায়গা থাকবে না।

অনেকক্ষণ ধরে তাকিয়ে রইলাম ওর ব্যাকুল মুখখানির দিকে, তারপরে আস্তে হাতখানা ছাড়িয়ে নিয়ে মুখটা অন্যদিকে ফিরিয়ে বলে উঠলাম—বেশ, তাই হবে।

বলে, আর দাঁড়ালাম না, দ্রুতপদে বেরিয়ে এলাম পুতুলের ঘরের কাছ থেকে। এবং সেই যে বেরিয়ে এলাম, আর যাইনি সেখানে দীর্ঘ দিন। কোনোদিন যে যেতে হবে, এ-ও আর ভাবনায় স্থান দিই নি। শীত এলো, শীত যায়-যায়।

মহাবীরের সঙ্গে দেখা হয় কম, শুনছি, ও নাকি সদরে বদলি হয়ে যাবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করছে। হাঁটতে চলতে মুখোমুখি দেখা হয়ে গেলে ও মাথা নীচু ক'রে পাশ কাটিয়ে চলে যায়, আমার মুখখানাও ঘৃণায় ওঠে কুঞ্চিত হয়ে। ওকে কিছু বলতে আমারও আর কেন যেন প্রবৃত্তি হয় না।

এরও দিনকতক পরে, এমন হলো, যে, মহাবীরকে আর দেখতেই পাই না। তবে কি সত্যিই বদলি হয়ে গেল ও? কানাঘুষোয় শুনলাম, তা নয়, মহাবীর ছুটি নিয়েছে। ওর স্ত্রীর নাকি খুব অসুখ।

অসুখ! বুকের ভিতরটা কী অদ্ভুত মোচড় দিয়ে উঠল হঠাৎ। কী অসুখ করেছে তোমার, কী কঠিন অসুখ?

ইচ্ছে হলো, এখুনি এই মুহূর্তে ছুটে চলে যাই পুতুলদের ঘরে, রোগশয্যার শিয়রে বসে, ওর কপালে হাতখানা রেখে বলে উঠি, কী কষ্ট হচ্ছে তোমার, বলো?

কিন্তু না, কর্মের শৃঙ্খলে নিজেকে বেঁধে রাখলাম প্রাণপণ শক্তিতে।

তার পরদিন, সকালবেলা। হঠাৎ এলো মহাবীর বিপর্যস্ত চেহারা নিয়ে, এসে দাঁড়ালো আমারই কাছে। বললে—সদর হাসপাতালে নিয়ে যাচ্ছি।

মুখ না তুলেই বললাম—কাকে?

—জানো না?—মহাবীর তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে তাকালো আমার দিকে,

বলল—কদিন ধ'রে জ্বরে বেহুঁশ। ভীষণ মাথার যন্ত্রণা। ঘাড়ের কাছে কোন্ শিরায় বুঝি টান ধরেছে। এখানকার ডাক্তারবাবু ভয় পেয়ে গেছে।

ঠাণ্ডা, নিরুত্তাপ গলায় বলে উঠলাম—বেশ ত, নিয়ে যাও সদরে।

না সরে, তখনো চুপচাপ দাঁড়িয়ে আছে মহাবীর, বলল—একবার গেলে ভালো হতো। আবোল-তাবোল বক্‌ছে। বলছে—কেন তুমি আমার মন বুঝলে না—কেন—কেন?

তেমনি ওর দিকে না তাকিয়েই বললাম—ও তোমাদের দুজনের ব্যাপার।

দৃঢ়কণ্ঠে বলে উঠল মহাবীর—না, আমাদের দুজনের ব্যাপার নয়।

মুখ তুলে তাকালাম ওর দিকে তীব্র দৃষ্টিতে, বললাম—কী বলতে চাও, কী?

মহাবীরের মুখখানা এবার বুঝি অনুণয়ে কোমল হয়ে এলো, বললে—যাবে না একবার দেখতে?

দৃঢ়কণ্ঠে বললাম—না, আমার সময় নেই।

মহাবীর বোধ হয় অবাক হয়েই তাকিয়েছিল আমার দিকে কিছুক্ষণ। দেখতে দেখতে মুখের ভাব অভিমানে থম্‌থম্ করতে লাগল, কোনক্রমে বললে—বেশ।

তারপরেই চলে গেল দ্রুত পায়ে।

আমার তখন একটু অবসর ছিল, চলে গেলাম হাটের দিকে, সেদিন হাটবার। হাট থেকে এটা-ওটা-সেটা টুকিটাকি জিনিষ কিনলাম অনেক, চুলের ফিতে, চিরুণী, এসেন্সের শিশি, তরল আলতা, স্নো, পাউডারের কৌটো। এসব নিয়ে, দারোগাবাবুর কাছ থেকে ছুটি নিয়ে চলে গেলাম বাড়ী।

রাখি আমার সাড়া পেয়েই ঘরে এলো। কিম্বা বলা যায়, ঘরে ঢুকে মাকে প্রণাম করবার পর, মা-ই দুটো-একটা কথার পর চলে গেল ঘর ছেড়ে, এবং পরক্ষণেই পাঠিয়ে দিলো রাখিকে। রাখি বললে—এ-গুলান কী?

—তোমার জন্য আনলাম।

—ক্যানে?

—ইচ্ছে হলো, তাই।

ভিতরে-ভিতরে সে খুবই খুসী হয়েছে, এটা বোঝা যায়, তবু মুখ গম্ভীর করবার চেষ্টা করতে করতে বললে—পয়সা খরচ হইল্ ত অনেক গুলান্?

—তা হোক, তোমার পছন্দ হয়েছে কি না বলো।

জিনিষগুলো নিয়ে যথাস্থানে তুলে রাখতে-রাখতে, এক সময় আমার দিকে মুখ ফিরিয়ে ফিক্ করে হেসে ফেললে, বললে—খুব খুসী হছি।

এগিয়ে গিয়ে ওকে টেনে নিলাম দুহাত দিয়ে বুকের মধ্যে, বললাম—রাখি, বেড়াতে যাবে?

খিলখিল করে হেসে উঠল, বললে—মোকও কেতাবী ভাষাত্ কথা কন?

—কী করি, অভ্যাস!

—অভ্যাস?—আমার কথার অনুসরণ ক'রে ও' আবার হেসে উঠল, তারপরে হাসি থামিয়ে অনুচ্চ কণ্ঠে বললে—মোক ছাড়ি দ্যান, কাঁয়ও দেখি ফেলাইবে।

ছেড়ে দিলাম। বললাম—বেড়াতে যাবে না?

—কোণ্টে?

—শহরে, সিনেমা দেখাবো।

চোখ দুটো খুসীতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল, বললে—এখ্‌খ নে ?

—না। এখন ছুটি নেই, থানায় ফিরে যাবো।

—তাহইলে ?

বললাম—রবিবার। রবিবার নিয়ে যাবো, কেমন ?

—মাওক কই ?

—কও।

ছোট্ট মেয়ের মতো ছুটে গেল ঘর থেকে।

কিন্তু আশ্চর্য মানুষ আমি। রবিবার সত্যিই ছুটি দিলে, কিন্তু বাড়ী যেতে মন চাইল না। 'দরওয়াজা' বা থানার ডিউটি ছিল করিম শেখ আর আলি মির্জা বলে দুজন কনেস্টবলের। আমি শুনেছিলাম, আলি মির্জার এ-রবিরার কী যেন দরকার ছিল ছুটি নেবার। ওকে গিয়ে বললাম—তুমি না বাড়ী যাবে ঠিক করেছিলে ?

বললে—বড়সাহেব ছুটি দিলে না।

বললাম—আমি ব্যবস্থা করে দেবো ?

ও আমার হাতদুটি জড়িয়ে ধরলে, বললে—পারবে ভাই ? আমার বাড়ী যাওয়া খুব দরকার। বউটার খুব অসুখ। বাড়ীতে বুড়ী আম্মা ছাড়া আর কেউ নাই।

বললাম—তোমার বউয়ের অসুখ, এতো বলনি আলি ?

চোখদুটো ছলছল করে এলো, বললে—এ-ও কি বলবার কথা ? সাহেবকে বলতে গেলাম, সাহেব বললে—তোমাদের সবার বউয়েরই কি এক সঙ্গে অসুখ করতে আরম্ভ করেছে হে ? মহাবীরের বউয়ের অসুখ, তোমার বউয়ের অসুখ। অন্য মতলব বার করো।

বললাম—দাঁড়াও, আমি দেখছি।

ব্যাপারটা কঠিন হলো না, বললাম—আমি ছুটি নেবো না স্যার, ওকে দিন, ওর সত্যিই দরকার।

সাহেব বললেন—বেশ। আমার আপত্তি নেই।

অতএব সারা রবিবারটা কাটল আমার ডিউটিতে। কিন্তু আট ঘন্টা-ই ত দিনের সবটুকু নয়, ডিউটির পরেও ত যেতে পারতাম বাড়ী। কিন্তু, বড়ো ক্লান্ত মনে হতে লাগল নিজেকে। বাড়ী গিয়ে রাধিকে নিয়ে শহরে যেতে মন সত্যিই চাইল না।

পরের রবিবার বাড়ী গেলাম, কিন্তু রাধি মুখ ভার করে রইল। মা বললে—গেল রবিবার বাড়ী আলু না ক্যানে ?

—থানায় কাজ ছিল।

মা বললে—আইজ যা ক্যানে শহরে——সিনেমাত ?

—উহু আজ নয়।

—ফির ?

অসহিষ্ণু কণ্ঠে বললাম—সে হবে'খন, শুভা শ্বশুরবাড়ী থেকে আসছে লিখেছে না ?

—হঁয়, তা তো আইস্‌ছে। তুই জানলু কেমন করি ?

—পিওনের কাছ থেকে চিঠি পড়ে নিয়েছি।

মা বললে—সেটাও হয়! পুলিশ হছিস, আর পিওন তোর কথা শুইন্‌বার নয় ? খুব শুইন্‌বে!

পুত্রের গৌরবে মা গর্বিত হয়ে ওঠেন।

এম্‌নি করে দিন যায়। শুভা এসে গেল বাড়ীতে। বললে—নাইরকেল আন্‌ছি দাদা, নাইরকেল ছাঁচে চিনি দিয়া সন্দেশ বানেয়া তোমাক খাওয়ামো।

রাধি ঘোম্‌টার আড়াল থেকে বলে—দাদার নাগি খুব আচ্ছা টান, বৌদিদিটা বুঝি কাঁয়ও নোয়ায় ?

শুভা দুষ্টুমী ক'রে বলে—নোয়ায়-এ তো? পরের মাইয়া—?

বলেই হেসে ফেলে। হেসে যে-কথা বললে, সে হচ্ছে ননদ-ভাজের রসিকতা, আমি তাড়াতাড়ি সরে গেলাম ওদের কাছ থেকে। শুনতে পেলাম, আরও জোরে হেসে উঠলে শুভা, বললে—দাদা নজ্জা পাইছে! রাধির কোলে একটা আসুক, ফির নজ্জা কোণ্ঠে থাকে, দেখমো এলা।

রাধি চাপা গলায় বলে ওঠে,—দূর হ, কী যে কবার ধচ্চিস না?

শুভা বললে—কই ভালো কথায়! রাঙ্গা ভাইবেটা ঘরে আন্ ক্যানে একটা, পেট ভরিয়া সন্দেশ খাওয়ামো।

শুভার হাসির মাঝখানে এবার মা এসে দাঁড়ালো বুঝলাম। মায়ের গলা পেলাম—কী কইস শুভা? এত দিন কাটি গেল, বউর কোলে গুড়া গাড়া আইল্ কোটে? নাতির মুখ দেখার সুখ কপালে নাই-এ বুঝি!

শুভা এবার রাগ করে বলে—কী কইস্ তুই মা? সময় কি গেইছে নাকি? হেঃ! তোরও যেমন কথা! নাতি—পুতি দেখবু তখন নিয়া যাবু।

এইসব কথা শুনতে শুনতে বড়ো বিরক্ত হচ্ছিলাম মনে মনে। শেষপর্যন্ত পায়ে-পায়ে বেরিয়েই পড়লাম বাড়ী থেকে, দেখি, গাঁ-টা একটু ঘুরে বেড়িয়ে!

এম্‌নি করে, কেটে গেল আরও একটি মাস। গাছের পাতায় পাতায় বসন্তের স্পর্শ লাগল, জীর্ণ পত্রগুলি ঝরে গিয়ে তরু-শিরে-শিরে জেগে উঠতে লাগল নতুন পত্রিকা!

এমন দিনে, হঠাৎ একসময় শুনলাম, স্ত্রীকে হাসপাতাল

থেকে বাড়ীতে নিয়ে এসেছে মহাবীর। স্ত্রী সেরে গেছে, কিন্তু এতো দুর্বল যে বিছানা ছেড়ে উঠতে পারবে না মাস দুই। খবরটা আমাকে দিয়েছিল ইয়াসিন। বলেছিল—সদরের হাসপাতালে একদিন আমিও গিয়াছিলাম মহাবীরের সঙ্গে।

বললাম—কেন! তুমি গেলে কেন?

ইয়াসিন বললে—মহাবীর ডেকে নিয়ে গিয়েছিল। বললে—আমার ভয় করছে একা যেতে, যাবে ভাই ইয়াসিন? বললাম—তা' আমাকে কেন, তোমার দোস্তকে নেও না? আমি তোমার কথাই বলেছিলাম। শুনে ওর মুখ গম্ভীর হয়ে গেল। বললে, না ওকে নেবো না। কেন ভাই, ঝগড়া হয়েছে নাকি তোমার, মহাবীরেব সঙ্গে?

বললাম—সেকথা মহাবীরকেই জিজ্ঞাসা করলে পারো। আসল কথা, অভিমান হয়েছে। আমি যাইনি কিনা, তাই। তা' ভাই ইয়াসিন, হাসপাতালে গিয়ে তুমি কী দেখলে?

ইয়াসিন বললে—এক ফকীরকে দেখেছিলাম ভাই হাসপাতালে। শুনলাম রোজই তিনি আসেন মহাবীরের স্ত্রীকে দেখতে, হাতে মেওয়া নিয়ে। কিন্তু, কাকে দেখবে? কাকে মেওয়া খাওয়াবে? তার ত হুঁস্ই ছিল না অনেক দিন।

এতসব শোনার পরেও আমি যাইনি তাকে দেখতে। দেখতে তাকে যাই-ও না, আবার বাড়ীতেও বিশেষ যাইনা। মার তীরস্কার বোনের অভিযোগ, স্ত্রীর অভিমান, কোনটাই মনে তেমন দাগ কাটে না!

এমনি করে দেখতে-দেখতে কেটে গেল আরও মাস দুই কাল। গ্রীষ্মের দিন। মাঝে মাঝে আকাশে আজকাল মেঘসঞ্চার হয় ঘনঘটা করে, শুরু হয়ে যায় কালবৈশাখীর তাণ্ডব, আর সঙ্গে

সঙ্গে নামে ঝরোঝরো বর্ষণ। দেখি, আর লুকিয়ে লুকিয়ে 'পদ্ম' লিখি।

দিন যায়। হঠাৎ একদিন শুনলাম, মহাবীরের স্ত্রী ভালো হয়ে গেছে। উঠে-হেঁটে বেড়াতে পারে। হয়েছিল মাথার অসুখ।

মহাবীর আগের মতোই আমাকে পরিহার করে চলত। ইদানীং পরিহারের মাত্রাটা বেড়ে গেছে আরও বেশী। সুতরাং এ হেন মহাবীরকে হঠাৎ একদিন আবার আমার কাছে এসে দাঁড়াতে দেখে, সত্যি বলতে কী, বিস্ময়ে অভিভূত না হয়ে পারি নি।

ধীর, চাপা গলায় প্রায় ফিসফিস করেই বলল—আসবে একবার? ওর বোধ হয় মাথারই একটু গোলমাল হয়ে গেছে। রাগ হলে হাসুয়াটা নিয়ে নিজের গলা নিজেই কাটতে যায়।

বললাম—এর সঙ্গে আমার কি সম্পর্ক? আমি যাবো কেন?

বলল—সে কথাটাও বলে মাঝে মাঝে—কেন আমার মন বুঝলে না, কেন—কেন?

শান্ত, অকম্পিত গলায় বললাম—এসব কথা আমাকে না বললেও পারতে।

আবার সেই তীক্ষ্ণ দৃষ্টি ফুটে উঠল ওর ছুটি চোখে, বললে—হঠাৎ বাইরে এত ছাড়া-ছাড়া ভাব? আড়ালে-আড়ালে দেখা সাক্ষাৎ হয় বুঝি?

—মহাবীর!—কণ্ঠস্বর এত তীব্র আর উচ্চ শোনালো, যে, সারা ব্যারাকের লোক সচকিত হয়ে হয়ে উঠল মুহূর্তে।

মহাবীর কিন্তু আর দাঁড়াল না, চলে গেল অন্যদিকে, দ্রুত পায়ে। ভয়ে নয়, তাচ্ছিল্যে।

আর, এদিকে, সমস্তটা দিন আমার মন ভরে রইল বিস্বাদে। একদিন গেল, ছুদিন গেল, তিনদিন গেল, চারদিনের দিন পড়ল

সাপ্তাহিক ছুটি। একবার মনে হলো, পায়ে-পায়ে যাই প্রেতলার দিকে, দূরের পথ থেকে শুধু সেই বাঁকা জামগাছটা মাত্র আসর দেখে, আর কিছু দেখব না, আর কাউকে দেখব না।

—ভেবো না, ঠিক মানিয়ে নেবো আমি, দেখো।

ভাগ্যের দোহাই অন্ততঃ আমি দেবো না। ঢের সয়েছি ভাগ্যের অত্যাচার, আর সইব না।—দেখে নিও, আমার ভাগ্যকে আমি ঠিক তৈরী করে নেবো।

মনে হলো, কথাগুলি কে যেন জোর করে আমার কানের কাছে ক্রমাগত আবৃত্তি করে চলেছে। একের পর এক। বুঝি আমাকে একেবারে পাগল করে দেবে।

দ্রুত পায়ে চলতে লাগলাম মাঠ পার হয়ে বাঙ্গালপাড়ার দিকে। শুভা ততদিনে চলে গেছে শ্বশুরবাড়ী, আছে মা আর রাধা। আমাদের দুজনকে জড়িয়ে শুভার সেই ছড়া-কাটার কথা হঠাৎ মনে পড়ে গেল বাড়ি ঢুকতে ঢুকতে।

রাধা গেল জল ভরিতে, কানাই নিলো পাছ।
হাতের বাঁশী ফেল্যা থুইয়া কানাই মারে মাছ!

কথাটা মনে হতেই হাসি এলো ঠোঁটের কোণে, একটু যেন হাল্কাও বোধ হলো মন। ছুটতে ছুটতে গিয়ে হৈ-হৈ করতে করতে মাকে ধরলাম দু'হাতে জড়িয়ে।

—আরে ছাড়্-ছাড়্, করিস কী তুই?

বাইরে বিরক্তি প্রকাশ করলেও মনে মনে কিন্তু খুশি হয়েছে মা, কিছুটা আশ্চর্যও বটে!

ঘরে এসে রাধা বললে একান্তে, মাথার ওপরকার ঘোমটাটা একটু সরিয়ে—হঠাৎ এত আহ্লাদ দেখি ক্যানে!

—আহ্লাদ নেই কবে?

—কোটে? বিয়া হুওয়া তক মুখখান আঁধার-আঁধার এ দেখি—একেবারে কাল বৈশাখী।

মুখের কথা মাত্র নয়, সেদিন রাত্রে সত্যিই শুরু হলো প্রবল কালবৈশাখী। প্রমত্ত ঝড়ে বড়ো-বড়ো গাছগুলি ডালপালা নিয়ে হুড়মুড় করে ভেঙে পড়তে লাগল। আমাদের ঘরগুলিও কাঁপতে লাগল থরথর করে! তারপর শেষ রাত্রের দিকে শুরু হলো প্রবল বৃষ্টি। রাধা ভয় পেয়ে দুহাতে জড়িয়ে ধরে আমাকে, আর আমার মনে পড়ে যায় আর একজনের কথা।

মনটা ব্যথায় কেন যে হঠাৎ চুরমার হয়ে যেতে চায়, কে তার উদ্দেশ দেবে! কেন যেন হঠাৎ মনে হতে থাকে, আমাকে তার আজ বড়ো দরকার, বড়ো দরকার তার আজ আমাকে। কিন্তু যাবো কেমন করে ছুটে তার কাছে, এই দুটি ভীরু কোমল মৃণাল বাহু পরিহার করে?

রাত্রিও ভোর হয়, বৃষ্টিও শেষ হয়। সকালবেলা জলযোগ করছি, মার সঙ্গে সাংসারিক এটা-ওটা কথা বলছি, রাধা নানান অছিলায় কাছে এসে ঘুর ঘুর করছে, তবু মনটা উৎফুল্ল হয়ে উঠতে চায় না। বার বার মনে পড়ে যাচ্ছে তার কথা! কোনো বিপদ আপদ হলো না ত তার? কালবৈশাখীর ঝড়ে ভেঙে গেল না ত পুতুলের ঘর?

কথাটা মনে হতেই উঠে পড়লাম তাড়াতাড়ি। মা বলে উঠল—কী হইল্? উঠলু ক্যানে? খাবার যে পড়ি থাকিল্?

—আর খাবো না। কাজের কথা মনে পড়ে গেছে। ভারী কাজ আছে আজ থানায়।

তাড়াতাড়ি প্যাণ্ট-জামা প'রে, পায়ে পট্টি লাগিয়ে, মাথায় টুপি প'রে, রওনা হ'লাম পথের দিকে। থানায় না গিয়ে, চলতে

লাগলাম ওদের বাড়ীর দিকে। ওদের বাড়ি যাওয়ার অন্য একটা সংক্ষিপ্ত পথ আছে, যদি গোটা দুই মাঠ ভেঙে যেতে পারি। সেই মাঠ-ভাঙা পথই বেছে নিলাম!

আজ ভাবি, এ আশ্চর্য ঘটনাই বা ঘটল কী ক'রে? সব ভুলিয়ে চুম্বকের মতো কে আমাকে এভাবে টেনে আনল ওদের বাড়ি? কিন্তু, না আনলেই বোধহয় ভালো হতো, যা দেখলাম, এ আমার পক্ষে না দেখাই ভালো ছিল।

আলুথালু বেশবাস, মাথার একরাশ রুক্ষ চুল খোপা ভেঙে এলিয়ে আছে, চোখের নীচে প্রগাঢ় কালিমা, উদভ্রান্ত দৃষ্টি দুটি চোখে। দেখা মাত্রই ছুটে এলো আমার দিকে। পাড়ার দুএকটি বউ-মেয়ে ছিল ওর কাছে দাঁড়িয়ে, তাদের দিকে একবারও ভ্রূক্ষেপ করল না। বললে—এসেছ! দড়ি কই? পরাও আমার কোমরে। সেই প্রথম দিন যেমন ক'রে পরিয়েছিলে, তেমনি ক'রে পরিয়ে আমাকে নিয়ে চলো। সেই বড়ো-বড়ো লোহার শিক দেওয়া জেল। এবার চুরি নয়, ডাকাতি। আমার স্বামীটাকে আমি নিজের হাতে কেটে ফেলেছি।

শিউরে উঠলাম সর্বাঙ্গে। রুদ্ধকণ্ঠে বলে উঠলাম—বলছ কী!

তেমনি উন্মত্তের মত বলতে লাগল—কেন কাটব না! আমার কি শুধু এই শরীরটাই আছে! পশুর মতো শুধু এটারই রক্ত খাবে! মন নাই! সেটার দিকে ত কেউ দেখে না—সেটার দিকে ত ফিরে চায় না।

বলতে বলতে ভেঙে পড়ে সে হু-হু করা কান্নায়।

আমি দুহাতে ওকে ধরে, ধীরে ধীরে বসিয়ে দিলাম দাওয়ায়।

আর সঙ্গে সঙ্গে ওর দুটো হাত মুষ্টিবদ্ধ হয়ে গেল, দাঁতে লেগে গেল দাঁত। বউগুলি তাড়াতাড়ি এগিয়ে এসে পরিচর্যা করতে

লাগল ওর। এক বর্ষীয়সী মহিলা শুধু আমাকে ডেকে নিয়ে গেলেন একান্তে, বললেন,—জ্ঞান ত নাই। কিন্তু ভাবনা নাই বাবা, আমরা আছি। তুমি চলে যাও সদর হাসপাতালে। খানিক আগে মহাবীরকে নিয়া গেছে সেইখানে।

রুদ্ধকণ্ঠে বলে উঠলাম, তবে এটা পাগলের প্রলাপ নয়! ওকে আঘাত করেছে পুতুল?

—না বাবা!—বর্ষীয়সী মহিলাটি বললেন—নিয়তি। রাইতের খাটুনী খাটি এই শ্যাষ রাত্তিরে ঐ গাছত্ উঠি উঁকি দিবার গেইছে ঘরে, আর বিষ্টিত ভিজা আছিল গাছ, হুড়মুড় করি পরি যায়া হাত পা ভাঙ্গি ফেলাইছে, মাথাটাও ভাঙ্গি ফেলাইছে। ওঃ সে কী রক্ত! এখনো ভিজা আছে মাটিটা রক্তে, দেখ ক্যানে।

ছুটতে ছুটতে এলাম থানায়। শুনলাম, খাঁ সাহেব নিজে ওকে নিয়ে চলে গেছেন সদর হাসপাতালে। গেলাম আমিও।

দুটি দিন ধরে যমে-মানুষে টানাটানি যাকে বলে।

ডাক্তার বললেন—রক্ত দিতে হবে। ব্লাডব্যাঙ্কে যে রক্ত জমা আছে, তার সঙ্গে ওর রক্তের মিল হচ্ছে না।

বললাম—আমার রক্তটা একটু দেখবেন?

এ-ও এক অদ্ভুত যোগাযোগ, আমার রক্তের সঙ্গে ওর রক্তের মিল হলো। কিন্তু হায়, রক্ত দিয়েও শেষ পর্যন্ত বাঁচাতে পারলাম না মহাবীরকে।

এর পরের ঘটনা সত্যিই সংক্ষিপ্ত। পুতুলের জ্ঞান ফিরে এসেছিল, কিন্তু মস্তিষ্কের লীলা শান্ত হয়নি, স্থির হয়নি।

খাঁ সাহেবের চেষ্টায়, আর সদর হাসপাতালের কর্তৃপক্ষের প্রাণপণ প্রয়াসে, ওর স্থান হলো কলকাতারই কাছে, এক উন্মাদ আশ্রমে।

রীতিমত ভীতিকর হয়ে ওঠে মাঝে মাঝে। বলে—ছিঁড়ে খাও দেখি আমাকে? কেটে ফেলবো।

তারপর সেই উন্মাদ আশ্রমে আমি গেছি বহুদিন পরে, অতি কষ্টে ছুটি নিয়ে একদিন দেখা করতে। সেদিন ছিল অতি শান্ত। মনে হলো চিনতেও পেরেছে। বললে—বাবা এসেছিলেন দেখতে।

—বাবা?

—আলি সাহেব। আমি ভালো হয়ে গেলে সঙ্গে করে নিয়ে যাবেন তাঁর কাছে।

বললাম—কী হয়েছে তোমার? কী অসুখ?

একটু হেসে বললে—কিছু না। মাঝে মাঝে মাথাটা কেমন গোলমাল হয়ে যায়।

তারপরেই চোখ দুটো তুলে আমার দিকে তাকালো স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে, বললে—ভেবো না, আমি ঠিক মানিয়ে নেবো, দেখো।

—কিন্তু কার সঙ্গে?

হঠাৎ যেন উদ্‌ভ্রান্তের মতো দেখালো ওকে। ক্ষণিকের জন্য হলেও, বুঝি বুঝতে পারে, যে, ও কতো অসহায় এই সুবিশাল বিশ্বলোকের মধ্যে। ছলছল করে উঠল দুটি চোখ। এগিয়ে এসে ধরল আমার দুটি হাত, কান্নাভরা কণ্ঠে বললে—কেন তুমি আমার মন বুঝলে না! কেন—কেন? কেন তুমি আমার বিয়ে দিলে?

আমার হাতের ওপরই ভেঙে পড়ল হু-হু করা কান্নায়। নার্স এসে সরিয়ে নিয়ে গেল ওকে, বললে—অবসন্ন হয়ে পড়েছে। ওকে শুইয়ে দেবো। আপনি যান।

চলে এসেছি। চলে এসেছি ওকে রেখে। ঘর, কারাগার, আশ্রম, উন্মুক্ত উদার বিশ্বপ্রকৃতি, সব যেন একাকার হয়ে গেছে ওর কাছে।

ট্রেন চলেছে ছুটে আমাকে ছিনিয়ে নিয়ে রাজমহল ঘাটের দিকে, সেখান থেকে গঙ্গা পার হয়ে, মাণিকচক ঘাট হয়ে ফিরে যাবো গাজোল, ফিরে যাবো নিজের বাড়ী। ভোর হবে, পাখী ডাকবে, যেমন চলছিল সংসার তেমনি চলবে। কিন্তু, কোথায় কার হৃদয়ে যেন পড়বে সপাং সপাং চাবুক—"কেন তুমি আমার মন বুঝলে না, কেন—কেন?"

সে কথা কেউ কোনদিন বুঝবে না, জানতেও পারবে না।

বার বার মনে পড়তে লাগল আমার সেই শিক্ষক মশাইয়ের মুখখানি, যিনি বলতেন,—"ওর নাম প্রমোদ নয়, প্রমাদ। বিধাতার বিশ্বগ্রন্থের ও এক মুদ্রণ-প্রমাদ!"

